সেই রাত

তখন পড়তাম ক্লাস নাইনে। ক্লাসের অনেক মেয়েই চশমা পরতো। কেউ পরতো সমস্যার কারণে। কেউ পরতো ফ্যাশনের কারণে। আমিও সমস্যার কারণে বর্তমানে চশমা ব্যবহার করি। কিন্তু জীবনের প্রথম চশমা নেয়ার কারণটা ছিল ভিন্ন।

আমার চেহারা তেমন আহামরি কিছুই নয়। যেহেতু বোরখায় চোখ দুটো ছাড়া সব কিছু ঢাকা থাকতো, তাই চোখ দুটোকে মনে হয় সবার কাছে, বিশেষ করে ছেলেদের কাছে একটু আকর্ষণীয় লাগতো।

একদিন এক পরিচিত দোকানের সেলসম্যান বললেন, আপনি খুব স্বার্থপর।

বললাম, কেন?

তিনি বললেন, আপনি আপনার চোখ দিয়ে সবাইকে দেখেন, অথচ অন্যকে আপনার চোখ দুটো ছাড়া কিছুই দেখতে দেন না। আপনার চোখ দেখেই বোঝা যায় আপনি খুব সুন্দর।

খুব রেগে গিয়ে বলেছিলাম, আপনার মতো অসভ্য ছেলেরা যাতে আমাকে দেখতে না পায় সেই জন্য বোরখা পরি। আরো অনেক কথা বলেছিলাম তাকে।

এরপর থেকে আর সেই দোকানে যাই না। এ রকম আরো অনেকেই চোখের সৌন্দর্য নিয়ে অনেক কথা বলতো। স্কুলে যেতে আসতে অনেক ছেলেরা ডিস্টার্ব করতো।

একদিন বিরক্ত হয়ে বান্ধবীদের বললাম, আশ্চর্য, আমার কি দেখে ছেলেরা পাগল হয়!

প্রায় সব বান্ধবীই বললো, তোর চোখ দেখে তোকে সবাই পছন্দ করে।

তাই একদিন সিদ্ধান্ত নিলাম চশমা পরে চোখ ঢাকবো।

মাঝে মধ্যে আমার চোখ ব্যথা করতো। শুধু ব্যথার কথা বললে আব্বা পাত্তা দেবেন, না এর জন্য আব্বাকে বললাম, দূরের জিনিস দেখতে অসুবিধা হয়।

আব্বা পরের দিনই বড় ভাইকে টাকা দিয়ে বললেন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে।

ডাক্তার দেখিয়ে প্রেসকৃপশন নিলাম। এবার শুরু হলো ফ্রেম পছন্দ করার পালা। আমার বড় ভাই আবার জিনিস বাছাইয়ের ব্যাপারে খুব খুতখুতে। আমার মনে হয় সেদিন শহরের এমন একটা দোকানও বাদ ছিল না যেখানে আমরা যাইনি। তারপর প্রথম সেই দোকানের ফ্রেমটাই পছন্দ করেছিলাম। দুই তিন ঘণ্টা ঘোরাঘুরির পর সেই দোকান থেকেই আটশ টাকা দিয়ে ফ্রেমটা কিনে চশমা অর্ডার দিয়ে বাসায় আসি।

এবার আমার বড় ভাই সম্পর্কে কিছু কথা বলি। তার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা একদম বন্ধুর মতো। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি, এমন ভাই পৃথিবীতে অন্য কোনো বোন পায়নি। আমি সব সময়ই একটু ইমোশনাল ও চাপা স্বভাবের মেয়ে। বড় ভাই তার সব কথা আমাকে বলতেন। আমিও আমার সব কথা বলতাম। কিন্তু আজো নিজেকে প্রশ্ন করে উত্তর পাই না, কেন জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটা করার আগে বড় ভাইকে জিজ্ঞাসা করিনি!

যেদিন চশমা ডেলিভারি দেয়ার কথা, আমি তো ভীষণ খুশি। আজ আমার চশমা আসবে, চশমা পরে সবার সঙ্গে দুষ্টুমি করবো। আমি ছাড়াও তখন ঘরে তিন চশমা বিশিষ্ট সদস্য ছিল।

যাই হোক। সেদিন নতুন চশমা এলো ঠিকই।

কিন্তু সেদিন আমার ও ভাইয়ার বন্ধুত্বের সম্পর্কে ফাটল ধরলো।

ভালোবাসা কি জিনিস তা ভালোভাবে বোঝার আগেই হঠাৎ ভালোবেসে ফেলি আমার সমবয়সী একটা সাধারণ ছেলেকে। কতো ভালো ভালো ছেলে আমাকে প্রেমের অফার দিয়েছে, সবাইকে এক কথায় ফিরিয়ে দিয়েছি। সব সময় ভাবতাম বড় ভাই জানতে পারলে খুব কষ্ট পাবেন।

ভাইয়ার এক বন্ধু ছিলেন মিঠু তিনি প্রতিদিন স্কুলে যাবার পথে বিরক্ত করতেন। চিঠি দিতে চাইতেন।

কিছু বলতাম না। শুধু হাটতাম।

একদিন তাকে বললাম, মিঠুভাই, আমি জীবনে কাউকেই ভালোবাসবো না, আমি আমার বড় ভাইকে প্রচণ্ড ভালোবাসি। তাকে কষ্ট দিয়ে অন্য কাউকে ভালোবাসা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

তিনি হেসে বড় ভাইয়ের নাম ধরে বললেন, তাকে ম্যানেজ করার দায়িত্ব আমার। তুমি শুধু রাজি হও। এমন আরো অনেক কথা।

কিন্তু আমি কাউকেই পাত্তা দিতাম না।

মিঠুভাই যখন আমাকে বিরক্ত করতেন তখন ভাইয়ার অন্যান্য বন্ধুরা যেমন অলিদভাই, বুনুভাই তারা দূরে দাড়িয়ে থাকতেন। অথচ অন্যান্য ছেলেরা যখন আমাকে বিরক্ত করতো তখন তারা বড় ভাইকে বলতেন, তোমার বোন রাস্তায় ছেলেদের সঙ্গে কথা বলে। আশ্চর্য! তারাও যে সেসব বখাটে ছেলেদের দলে সেটা আমার ভাইকে বলতেন না।

বড় ভাইয়ের সঙ্গে এমন সুন্দর সম্পর্ক ছিল যে, প্রেম ভালোবাসার কথা মনেই আসতো না। ভাইয়ার সঙ্গে এসব বিষয়ে খোলাখুলি আলাপ করতাম। সেই ছেলেটার সঙ্গে প্রেমটা হঠাৎ করেই হয়ে গেল। ঠিক হঠাৎ করে বললে ভুল বলা হবে। আস্তে আস্তে কখন যে তাকে এতো বেশি ভালোবেসে ফেলেছিলাম তা নিজেও টের পাইনি।

আমি খুব আড্ডা প্রিয়। প্রচুর বান্ধবী আমার। এর মধ্যে চার পাচজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বেশি। কিন্তু আশ্চর্য হলেও সত্যি, আমার ভালোবাসার কথা এই বান্ধবীরা জেনেছে অনেক পরে।

যেদিন চশমা ডেলিভারি দেয়ার কথা সেদিন তার কাছে আমার দ্বিতীয় চিঠি লিখছিলাম। তখন সম্পর্ক তিন চার মাস চলছে। রাত প্রায় দুইটা বাজে। চিঠি লেখায় মনোযোগ ও সাবধানতা এতোই বেশি ছিল যে, বড় ভাই কখন যে বাইরে থেকে এসে আমার পেছনে এসে দাড়িয়েছে তা টেরই পাইনি। যখন টের পেলাম তখন মনে হলো শরীর বেয়ে ঠাণ্ডা একটা স্রোত নেমে আসছে। পুরো শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যেতাম যদি ভাইয়া ধরে না বসিয়ে দিতেন।

আজো তার কথাগুলো স্পষ্ট কানে বাজে। তিনি আমার কাধে হাত রেখে বললেন, চিঠিটা দে, তোর কোনো ভয় নেই, আমি তোকে হেলপ করবো। এই বলে চশমাটা দিয়ে তার রুমে চলে গেলেন।

চশমাকে মনে হলো আছাড় দিয়ে ভেঙে ফেলি।

বড় ভাইয়ের আশ্বাস শুনে খুশি হতে পারিনি। কারণ আমি জানি, আমার পছন্দকে তিনি কোনো দিন মেনে নেবেন না। এবং নেয়ার কথাও নয়।

কিছুক্ষণ পর ভাইয়া আমাকে পড়তে ডাকলেন। এমন একটা ভাব যেন কিছুই হয়নি। কিছুক্ষণ পর আব্বা এলেন অফিস থেকে। এসেই জোরে জোরে বলতে লাগলেন, কইরে, নতুন চশাওয়ালী কই?

আমি ডাকে সাড়া দিচ্ছি না বলে আব্বাই ভাইয়ার রুমে ঢুকে বললেন, কি রে, চশমা পরছিস না কেন?

এই কথায় কেইস থেকে চশমাটা বের করে পরে প্রথমে আব্বাকে দেখাই।

তারপর আব্বা বললেন, শুধু শুধু আমার এক হাজার টাকা খরচ করলি। এই বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

এরপর রাত একটার পর শুরু হলো বড় ভাইয়ের জেরা। প্রায় আধঘণ্টা ধরে ভাইয়া আমাকে বললেন, ছেলেটা কে, নামটা বল।

অনেকক্ষণ পর নামটা বললাম।

নামটা শুনে ভাইয়া অনেকক্ষণ মাথায় হাত দিয়ে বসেছিলেন।

আমার খুব খারাপ লাগছিল।

তিনি কল্পনাই করতে পারেননি যে, তার এতো আদরের বোন এমন একটা ভুল করতে পারে। আমিও জানি না কিভাবে এমন ভুল করলাম!

অনেক চেষ্টা করেও আমি তার কাছ থেকে ফিরে আসতে পারিনি। তাকে যেমন প্রচণ্ড ভালোবাসতাম তেমনি ভয় পেতাম।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, ওই দিনের পর থেকে প্রায় আড়াই বছর তাকে কোনো চিঠি লিখিনি। দুই এক মাস পর পর রাস্তায় এক দুই মিনিটের জন্য দেখা হতো। কিন্তু তার প্রতি ভালোবাসা এক ইঞ্চি পরিমাণও কমেনি। বরং দিন দিন বেড়েই চলছিল। সব সময় অন্যমনস্ক হয়ে থাকতাম। নামাজ পড়ে দোয়া করতাম যেন আমাদের সম্পর্কটা শেষ হয়ে যায়।

একদিন রাস্তায় দিয়ে হাটছি। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম এক চোখে খুব বেশি সূর্যের তাপ লাগছে। চোখে হাত দিয়ে দেখি ফ্রেমের স্ক্রু ঢিলে হয়ে একটা গ্লাস কখন পড়ে গেছে আমার খবর নেই।

আমার বান্ধবী আমাকে দেখে তো হাসতে হাসতে অস্থির।

কারণ এক চোখে ফটো সানগ্লাস কালো হয়ে আছে আর অন্য চোখে ফাকা ফ্রেমে চোখ দেখা যাচ্ছে। তারপর অনেক দূর পেছনে হেটে দেখি রাস্তার ঘাসের পাশে পড়ে আছে গ্লাসটা।

এই নয় বছরে অনেক চশমা ব্যবহার করেছি। কোনোটাই যত্নে রাখিনি। জীবনের প্রথম চশমাটা আজো আমার কাছে যত্ন সহকারে আছে যেটা ধরলে এখনো সেই রাতের কথা মনে পড়ে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত আমি আমার বড় ভাইয়ের সামনে সহজভাবে কথা বলতে পারি না।

যাযাদির মাধ্যমে আমার দেবতুল্য ভাইয়ের কাছে মাফ চাচ্ছি। বিশ্বাস করুন ভাইয়া তার মায়ের কারণে আমি তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে বাধ্য হয়েছিলাম। আমি জানি, আপনি আমাকে তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখার কারণে প্রচণ্ড ঘৃণা করতেন এবং মনে হয় এখানো করেন। কিন্তু এ কথাও জানি যে, আপনি নিশ্চয়ই আমাকে মন থেকে মাঝে মধ্যে দোয়া করেন যার কারণেই আজ আমি সুখী।

নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

স্টাডি টুর

– রচনা

আপা! আপনার যখন চশমার দরকার হয়েছে তখন তা কবিতার শ্বশুরবাড়ির লোকদের বলতেন। তারা আপনাকে ভালো চশমা কিনে দিতো পারতো। কথাটা আমার ভাবীর আম্মা তার বড় বোনকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন।

আমাদের পরিবারের সবাই অর্থাৎ আমার চার ভাই, আম্মা-আব্বা এবং আমি সবাই চশমা ব্যবহার করি। আমি ছাড়া বাকি সবারই বেশ পাওয়ারফুল চশমা। বুঝতেই পারছেন, আমরা হলাম কবিতার শ্বশুরবাড়ির লোকজন।

চোখের ডাক্তারের কাছে গেলে একটা চশমা ধরিয়ে দেবে এ কথা মোটামুটি সবারই জানা। ছোটখাটো সমস্যা হওয়াতে আমাকে ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হয়েছে।

ডাক্তারকে সমস্যার কথা বলতে গিয়ে বোঝাতে চাইলাম আমার রোদে গেলে চোখ জ্বালা পোড়া করে, পানি পড়ে ইত্যাদি।

মনে মনে ক্ষীণ আশা ছিল, ডাক্তার হয়তো বলবেন, আসলে তোমার খুব বেশি সমস্যা নেই। রোদে বের হওয়ার সময় অবশ্যই সানগ্লাস পরে বের হবে। কিন্তু ডাক্তারের কানে আমার মনের কথা পৌছেনি। ফলাফল কিছু ট্যাবলেট, ড্রপ এবং একখানি চশমা। এই হলো আমার চশমা প্রাপ্তির কাহিনী।

সময় গড়িয়ে যায়। এর মধ্যে আমার চশমাটা দীর্ঘ দিন অব্যবহারে হারিয়ে যায়। সমস্যার চেয়ে সানগ্লাস পাওয়ার তীব্র বাসনায় আবারও ডাক্তারের কাছে গেলাম যদি এবার মনোবাসনা পূর্ণ হয়! এবারের ডাক্তার ভিন্ন। তবে ফলাফল অভিন্ন। দুঃখের আর সীমা রইলো না।

আসলে সানগ্লাসের প্রতি আমার ছোট বেলা থেকে ছিল দুর্দমনীয় লোভ। তখন কাউকে সানগ্লাস পরা দেখলে চিরসুখী মনে হতো। এখন অবশ্য চিরসুখী মনে না হলেও মোটামুটি সুখী মনে হয়। ছোটবেলা পার করে বড়বেলায় এলেও আমি এখনো সানগ্লাস সুখ থেকে বঞ্চিত।

মাঝখানে অবশ্য আমাদের স্টাডি টুর উপলক্ষে কিছু টাকা এদিক-সেদিক করে দুইশ টাকা দামের একটা সানগ্লাস কিনে ফেললাম। নির্ধারিত দিনে, নির্ধারিত সময়ে আমাদের নির্দিষ্ট স্থানে এসে পৌছালাম। বাস থেকে নামার সময় টুপ করে সানগ্লাসটা পরে নিলাম। খেয়াল করলাম আমার ফ্রেন্ডরা আড়চোখে তাকাচ্ছে।

একজন বললো, ইশ! আমার সানগ্লাসটা আনার কথা ভুলেই গেলাম।

আমি মনে মনে হাসি। অবশ্য অনেকে মনে করে ঠিকই এনেছে। তবে তারা তো আর আমার মতো নতুন ইউজার নয়।

এর মধ্যে সময় পার হচ্ছে, গল্প করছি। বিচের পানিতে পা ডুবিয়ে হাটছি এবং ফাকে ফাকে সানগ্লাস পরিহিত অবস্থায় ছবি তুলছি। সব কিছু এতো সুন্দর লাগছে। উল্লেখ্য, এটি ছিল আমার জীবনের প্রথম স্টাডি টুর। একই সঙ্গে প্রথম সানগ্লাস ব্যবহার। আমার আনন্দ আর ধরে না। এর মধ্যে আমাদের অংকস্যার আমার সানগ্লাস পরে ছবি তুললেন।

যথানিয়মে দুপুর দুটার দিকে লাঞ্চের ডাক পড়লো। সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। খাওয়া পরবর্তী হাত ধোয়ার সময় খেয়াল হলো, সানগ্লাসটা নেই। নেই তো নেই-ই।

সবাই মিলে খোজাখুজি করলো। কিন্তু ফলাফল শূন্য।

আমার নয়নে সানগ্লাস সুখ সহ্য হলো না। এরপর মন খারাপ করে বাসায় ফিরলাম।

এদিকে এতোবড় দুঃখের কথা কাউকে বলতেও পারছি না। যেহেতু এটি কেনার কথা কাউকে বলিনি। তবে স্মৃতি হিসেবে থেকে যায় ওই দিনের তোলা ছবিগুলো।

আমাদের বাসায় সানগ্লাস জাতীয় খরচগুলো সব সময় অপচয় হিসেবেই ধরা হয়। যেখানে প্রয়োজন মেটানো দায় সেখানে আবার বিলাসিতা কেন?

তবে কয়েকদিন আগে আমার আম্মা আমার সানগ্লাস প্রীতি দেখে তার স্বল্প বাজেট থেকে অল্প পরিমাণ টাকা বরাদ্দ করেছেন। আশা করি টাকাটা তাড়াতাড়ি আমার হস্তগত হবে।

উত্তর আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম থেকে

সন্ধান পেয়েছি

– আহমদ মঈনুদ্দীন

গোরে গোরে, মুখরেতে
কালা কালা চশমা...।

কলম দিয়ে তো আর গান শোনানো যায় না! তাই চশমা বিষয়ক লেখায় পাঠক বন্ধুদের একটু স্মরণ করিয়ে দিলাম গানটির কথা।

যারা চশমা পরেন তাদেরকে অনেকেই বলেন, চার চোখ। অনেকে আবার *কানা*-ও বলে থাকেন। অস্ফুট বুলির শিশুরা চশমাকে বলে *চমশা*।

শৈশবে তালপাতা, নারিকেলপাতা দিয়ে কতো চশমা বানিয়েছি তা আজ কেবলি স্মৃতি। চোখের সমস্যার কারণে চক্ষু বিশেষজ্ঞের পরামর্শে আমরা চশমা পরি। শখ করেও চশমা পরি। সূর্যের প্রখর আলো থেকে চোখ বাচাতে আমরা সানগ্লাস পরি।

অবশ্য অনেক প্রেমিককে দেখা যায়, প্রেমিকার কাছে নিজেকে স্মার্ট নায়ক হিসেবে তুলে ধরতে ছায়া সুনিবিড় পরিবেশে কিংবা ঘরের মধ্যেও সানগ্লাস পরে থাকেন।

আমরা কোনো জিনিসের নিরাপত্তার জন্য বলি, *চোখে চোখে রাখো*। কিন্তু চোখে চোখে রাখলেই কি সব কিছুকে রক্ষা করা সম্ভব? চোখের সবচেয়ে কাছের বস্তুটি হলো চশমা। তাও তো এ রাজধানী ঢাকায় চোখ থেকে চশমা ছিনতাই হয়ে যেতে দেখেছি।

বাসে ভিড়ের মধ্যে একদিন দেখলাম, একজন আরেকজনের চোখ থেকে চশমা টেনে নিল। আমরা প্রত্যক্ষদর্শীরা মনে করলাম লোকটি হয়তো তার বন্ধু হবে। বন্ধু কিংবা পরিচিতজন ছাড়া তো আর চোখ থেকে চশমা টেনে নিতে পারে না। চশমাওয়ালাও হয়তো তেমনি কিছু ভেবেছিলেন। কিন্তু লোকটি তো চশমা নিয়ে গাড়ি থেকে লাপাত্তা।

আরেক দিনের কথা। এক চশমা পরা ভদ্রলোক বাসের জানালার পাশে বসে বাইরের দৃশ্য দেখছেন। যানজটের কারণে বাস ধীরে ধীরে চলছে। হঠাৎ করে বাইরে থেকে এক ছিনতাইকারী চোখ থেকে চশমাটি টেনে নিল।

আমরা শুধু চেয়ে থাকলাম বেচারার চশমা হারানো চোখের দিকে। চোখ থেকে চশমা ছিনতাই হয়ে যাওয়াটা সম্পদ হারানোর বেদনার চেয়েও কঠিন অপমানজনক।

আমি অবশ্য সেদিন থেকে বাসের জানালার পাশে বসলে চশমার ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকি। পাঠক মহল, আমার নিজের চশমা নিয়ে লেখার আগে আপনাদের সঙ্গে আমার চশমার পরিচয় হওয়াটা দরকার নয় কি? আমার চশমাটি হলো কালো কার্ব ফ্রেমের স্বচ্ছ কাচ বিশিষ্ট পাওয়ারওয়ালা চশমা।

আমার বয়স অনুযায়ী এ ফ্রেমটা প্রযোজ্য নয়। কিন্তু এটা আমার চেহারায় খুব মানিয়েছে মনে করেই পছন্দ করেছি।

কলেজে আমার এক বান্ধবী চশমাটা দেখে আপত্তির সুরে বললো, কি একখান ফ্রেম লাগিয়েছে!

আমার এ চশমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুবই নিবিড়। কারণ তাকে অনেকবার হারিয়েছি এবং অনেক বার পেয়েছি। দীর্ঘ এক মাস হারিয়ে থাকার পরও যখন আরেকটি চশমা কেনার উপক্রম তখনো আমি তাকে পেয়েছি। এমনকি আজ যখন চশমা নিয়ে লিখছি তখনো চশমাটি আবারও নিখোজ।

এ চশমা পরে কতো বিষয় নিয়ে লেখালেখি করেছি, অথচ চশমা নিয়ে লিখিনি। হয়তো অভিমানেই সে এবার হারিয়েছে। জানি না এবার তাকে পাবো কি না। তার কাছে আমার এ আহ্বান –

প্রিয়তমা চশমা

তুমি ফিরে এসো। তোমার জন্য আমার চোখ অশ্রুসিক্ত। তোমার জন্য আমার নাক কাদে, কান কাদে, তুমি ফিরে এসো। এবার আমি তোমায় নিয়ে লিখছি।

প্রিয় পাঠক, চশমাটিকে নিয়ে যখন এ পর্যন্ত লেখার পরিকল্পনা শেষ তখনই আমার চশমার অভিমান ভেঙেছে। আবারও তার সন্ধান পেয়েছি।

আমারও একটা বিশ্বাস ছিল, বার বার যখন তাকে পেয়েছি তখন এবারও তাকে পাবো। আমাকে ছাড়া সে কি থাকতে পারে?

ঢাকা থেকে

আর্মি অফিসার

– ইকবাল

ক্লাস নাইন থেকে চশমা ব্যবহার করছি। বুদ্ধি হওয়ার পর থেকে দেখছি বাসার সবার চোখে চশমা। মায়ের কাছে শুনেছি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে অনেকের নাকি *বেরিবেরি* হয়েছিল। চোখের সমস্যাও এ বেরিবেরি থেকেই হয়েছে। আমার তখন জন্মই হয়নি। তবু ছাড়া পাইনি। দূরের জিনিস দেখি না। পাওয়ার বাড়তে বাড়তে মাইনাস ৩-এ এসে দাড়িয়েছে। সঙ্গে আছে নানান ধরনের এক্সিস, এংগল ও বাইফোকাল লেন্স ইত্যাদি।

স্কুল ও কলেজে সাধারণ ফ্রেম ব্যবহার করেছি। কিন্তু ইউনিভার্সিটিতে শখের বশে পাইলটদের মতো ফ্রেম ব্যবহার করতাম। রে-ব্যান বেশ দামি। তাই *অলটেন* ব্যবহার করতাম। তখন কালো রঙ-এর ফ্রেমে শাদা গ্লাস ব্যবহার করতাম। চাকরিতে এসে ফটোসান ব্যবহার শুরু করেছি।

বিএসসি পড়ার সময় পাইলট হওয়ার আশায় ঢাকা হলের পেছনে পিএএফ রিক্রুটিং সেন্টারে গিয়েছিলাম। চোখে চশমা দেখে পত্র পাঠ বিদায়।

পাইলট হতে না পেরে ভাবলাম ফ্লাইট স্টুয়ার্ড হবো। তাই পিআইএ-তে দরখাস্ত দিয়ে রাইসভাইকে (রাইস উদ্দিন আহম্মদ, পিআইএ ও তৎকালীন পিআরও) জানালাম।

রাইসভাই ধমক দিয়ে বললেন, পড়াশোনা করো, চাকরির প্রয়োজন নেই।

গেল আমার আকাশে ওড়ার শখ।

চাকরি নিয়ে গেলাম যশোর। ছোট চুল, স্মার্ট ফিগারের সঙ্গে পাইলট মার্কা চশমা। সবার কাছে পরিচিত হয়ে গেলাম আর্মি অফিসার হিসেবে।

১৯৭২ সালে ফরিদপুর বদলি হয়ে গেলাম। তখন রক্ষীবাহিনীর যুগ। অনেকেই ভাবতো রক্ষীবাহিনীর সদস্য। সেখানে আরো সমস্যা। বাজারে গেলে কিছু কিনতে পরতাম না। সবার এক কথা, *স্যার ক্যাম্পে পৌঁছে দেবো*। আমার আর কিছু কেনা হতো না।

বদলি হয়ে এলাম কুমিল্লার চান্দিনায়। সেখানেও সমস্যা। ইনডিয়ান কোনো জিনিস চাইলেই দোকানির উত্তর, *নাই স্যার*। অথচ দেদারসে *বোরোলিন* বিক্রি হচ্ছে।

সবচেয়ে বেশি মজা হয়েছিল প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের *হ্যা-না* ভোটের সময়। আমি একটি কেন্দ্রের পৃজাইডিং অফিসার। কেন্দ্রের কাছে বেশ কিছু লোকের হল্লা শুনে বের হতেই তারা চলে গেল।

ভোট শেষে জানতে পারলাম প্রেসিডেন্টের বেশ কিছু সমর্থক কুমিল্লা থেকে এসে বিভিন্ন কেন্দ্রের পৃজাইডিং অফিসারকে বেশি ভোটার দেখানোর জন্য অনুরোধ করছিল। আমাকে আর্মি অফিসার মনে করে কাছেই আসেনি। আরো পরে শুনেছি, তারা কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে, এমনকি ঢাকাতেও খোজ নিয়েছিল কেন আর্মি অফিসার দেয়া হয়েছে?

আমাকে প্রায়ই অফিসের কাজে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের ভেতর দিয়ে *বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন একাডেমি* (বার্ড)-তে যেতে কতো যে স্যালিউট পেয়েছি হিসাব নেই।

রংপুরে থাকতে তৎকালীন কৃষিমন্ত্রী মেজর জেনারেল মাহমুদুল হাসানও আমাকে আর্মির লোক বলতেন। ব্যাপারটা আর কিছু নয়, ওই চশমা আর ছোট চুল।

চশমাটা নিয়ে এমন হয়েছে যে, কেউ-ই বিশ্বাস করতে চায় না যে, আমি একজন কৃষি বিজ্ঞানী। তাদের কথা, আর্মি না হলে বিডিআর তো বটে। না হয় নিদেন পক্ষে পুলিশ।

২০০০ সালে সরকারি কাজে অস্ট্রেলিয়া গিয়েছিলাম। প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর ড. কাইয়ুম পারভেজ নিয়ে গিয়েছেন ক্যানবেরা-য়। থাকার ব্যবস্থা ইউনিভার্সিটির ডরমিটরিতে। বিছানার ওপর চশমাটা রেখে

টয়লেট থেকে হাত মুখ ধুয়ে এসে বেখেয়ালে বিছানায় রাখা চশমার ওপরই বসলাম। মুহূর্তে চশমা দুমড়ে-মুচড়ে একাকার। ভাগ্য ভালো কাচ ভাঙেনি। তাই দেখা হলো না অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত টেলিফোন কম্পানি টেলস্টার টাওয়ার থেকে রাতের ক্যানবেরা-র মোহনীয় দৃশ্য।

চশমা নেই। কাছের জিনিস কিছু কিছু দেখলেও দূরের কিছু দেখি না।

পরদিন সকালে ড. পারভেজের জোরাজুরিতে এক চশমার দোকানে গেলাম। প্রথমে তারা কোনো রিস্ক নিতে চাইলো না। ভেঙে গেলে কোনো দাবি নেই জানালে তারা আধঘণ্টার মধ্যে ঠিক করে দিল।

আশ্চর্য! একটি পয়সাও নিতে চাইলো না তারা। নিজের কাছে খারাপ লাগলো। তাই সাড়ে তিন ডলার দিয়ে চশমার কাচ পরিষ্কার করার সলিউশন কিনলাম। আমাদের দেশে চশমার দোকানে শাদা পানি দিয়ে চশমার কাচ পরিষ্কার করা হয়ে থাকে।

ঢাকা থেকে

ঋজু

– এ. সিদ্দিকী

হঠাৎ কেন যেন সানগ্লাস কেনার ইচ্ছায় পেয়ে বসলো। যদিও সানগ্লাস পরতে খুব লজ্জা পেতাম।

যাহোক, নিজের পছন্দেই একটি সানগ্লাস কিনলাম। স্টুডেন্ট বলে টাকা পয়সা খুব একটা না থাকায় অল্প দামেই কিনতে হয়েছে সানগ্লাসটি। তারপরও বন্ধুদের মতে সানগ্লাসটি নাকি আমাকে খুব মানিয়েছে। তাই মাঝে মধ্যে সানগ্লাসটি পরার চেষ্টা করতাম।

আমার ক্লাসমেট হওয়ার কারণে পান্নার সঙ্গে টুকটাক কথা হতো। পান্না প্রায়ই চাইতো আমার লজ্জাটাকে ভাঙানোর।

একদিন পান্না আমাকে নিয়ে গেল আমাদের কলেজের কাছে তার খালার বাসায়। সেখানে পরিচয় করিয়ে দিল তার খালার সঙ্গে। সেই সঙ্গে তার খালাতো বোন ঋজুর সঙ্গে। ঋজু আমার ক্লাসেই পড়তো। কিন্তু অন্য কলেজে। খুব একটা সুন্দরী না হলেও কেমন জানি একটা ভালো লাগা আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো প্রথম দেখাতেই।

ঋজুদের বাসা কলেজ হস্টেলের কাছাকাছি হওয়াতে প্রায়ই কারণে-অকারণে দেখা হয়ে যেতো আমাদের। সানগ্লাসটি পরিহিত অবস্থায় ঋজুর সঙ্গে একদিন দেখা হয়ে গেল।

সেদিনই সে প্রথম আমাকে বললো, সানগ্লাসে তোমাকে দারুণ লাগছে।

সেই থেকে আমার ভাবনাও বেড়ে গেল।

ঋজু খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিল বোমা মেরেও আমার মুখ থেকে কথা ফোটানো যাবে না। তাই পান্নার মাধ্যমে সে আমার কাছে একটা চিরকুট পাঠালো। তাতে লেখা ছিল,

আগামীকাল সকাল দশটায় অবশ্যই আমাদের বাসায় আসবে। আর যদি না আসো...।

সকাল দশটাতেই ঋজুদের বাসায় গেলাম। আমি খুব ভীত ও নীরব। ক্যাসেট প্লেয়ারে গান বাজছিল।

বাধিনি হৃদয়ের পিঞ্জরে, রেখেছি মুক্ত করে...।

হঠাৎ নীরবতা ভেঙে ঋজু আমাকে বললো, তোমাকে একটি কথা বলবো, কিছু মনে করবে না তো? তোমাকে আমার খুব ভালো লাগে। তোমাকে আমার খুব পছন্দ হয়।

একেবারে থ হয়ে গেলাম। কি যে বলবো বুঝে উঠতে পারছি না। শুধু এটুকু বললাম, সামনে আমাদের পরীক্ষা আর তুমি এখন এ কথা বলছো! এটা বলেই চলে এলাম।

হস্টেলে এসে আর স্থির হতে পারলাম না। দুই দিন পরে রোজার প্রথম দিনে দুটি গোলাপ কিনে সব লজ্জার মাথা খেয়ে চলে গেলাম ঋজুর কাছে। গোলাপ দুটি তাকে দিয়ে শুধু এটুকু বললাম, ঋজু, ফুলের ভাষা বোঝো তো? এর চেয়ে বেশি কিছু আর বলতে পারলাম না।

আমার কথাটি শুনে সে শুধু মুচকি হাসলো।

জানি না আমার হৃদপিণ্ডের স্পন্দন তখন কতো বেড়েছিল।

সেই থেকে আমাদের ভালোবাসা। এখন আর লজ্জা নেই। কোনো মেয়ে দেখলেও ভয় লাগে না। অন্য দশটা প্রেমিক জুটির মতো আমিও এখন পারি ঋজুকে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে। নীরবতা পেলে ঋজুকে দুই একটা কিস দিতে কিংবা জড়িয়ে ধরতেও ভুল করি না। অবশ্য ঋজুও কম যায় না। ঋজুর অনুপ্রেরণায় আজ আমি প্রকৌশল ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে পেরেছি। এখন দুই পরিবারের সদস্যরাই আমাদের এ ভালোবাসার কথা জানে।

আগের চেয়ে জীবনটা অনেক সুন্দর মনে হয়।

ঢাকা থেকে

দিন যায় কথা থাকে

– মোহাম্মদ আবদুর রহমান

আষাঢ়ের শেষ তারিখে বৃষ্টি হচ্ছে। এ অবস্থায় নাজমাকে বললাম, শাড়িটা বদলে নাও। চশমা তো শেখ হাসিনার মতোই পরেছো। চলো ছাতা মাথায় দিয়ে দাওয়াত রক্ষা করে আসি।

নিজেও ফিটফাট হয়ে শেখ সাহেবের মতো কালো চশমা পরে, পাঞ্জাবি পরতে গিয়ে দেখি পাঞ্জাবির একটা বোতাম নেই। সুচ–সুতা নিয়ে বসে গেলাম। কিন্তু সুচে কিছুতেই সুতা পরাতে পারছি না, বার বার লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছে। চশমাটা ইদানীং খুবই ট্রাবল দিচ্ছে। আইভিকে ডাকলাম।

সে এসেই বললো, কি জন্যে ডেকেছো নানাভাই?

আরে দেখতো সুচে সুতা পরাতে পারিস কি না?

আইভি বললো, নানাভাই, তুমি এতো সুন্দর চশমা পরেও আমাকে ডেকেছো সুতা পরাতে। দাও বলে খুব জোরের সঙ্গে আমার হাত থেকে সুচ–সুতা নিয়ে নিমেষেই তা পরিয়ে দিল। এবং আমাকে মিষ্টি সুরে বললো, দেখলে নানাভাই, তোমার মতো সুচের ছিদ্র বার বার খুজতে হলো না।

বললাম, *এয়সা দিন নাহি রহেগা।* মানে বুঝলি না তো? তার মানে, *এ রকম দিন চিরদিন থাকবে না।* তোমার মতো আমারও চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল, ছিল চাহনি। আর আজ চশমা নিয়েও কাজ হচ্ছে না। মেঘে মেঘে এতো বেলা হয়ে গেছে। এই তো মনে হচ্ছে সেদিনকার কথা। স্কুল থেকে কলেজ, কলেজ থেকে ইউনিভার্সিটি পেরিয়ে চাকরি আবার ব্যাক টু দি প্যাভিলিয়ন।

চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত অনেকের চশমার প্রয়োজন হয় না। চল্লিশের পরে আবার অনেকের চশমার প্রয়োজন হয় কিছু দিনের জন্য। পরে এই অস্বচ্ছতা কেটে যায়। এবং ভালোভাবে লেখাপড়া করতেও পারে। আমার বেলায় এ যুক্তি খাটলো না। আমার চশমা নিতেই হলো চল্লিশের শুরুতেই যার পাওয়ার প্লাস দশমিক দুই পাচ।

এখানে অভিনব চশমার এক স্মরণীয় স্মৃতি এখনো মনে আছে। তা হলো, আমার বয়স তখন পনেরো থেকে সতেরো বছর হবে। কতো রঙবেরঙয়ের চশমা, ফ্রেম দেখেছি, জ্ঞানী–গুণী, সুধীজনদের চোখে। তবে সে সময় যে চশমার কথা বলছি সেটা আমার কাছে অতি বিরল মনে হয়েছে। অবশ্য এখন তো সচরাচর এটা দেখা যায়।

১৯৪৬ সালের কথা। কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উত্তরবঙ্গে এক ঝটিকা সফরে বের হন এবং এক পর্যায়ে তিনি রংপুর, দিনাজপুর যাওয়ার পথের যাত্রা বিরতি দেন। ঈশ্বরদী রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে হায়রে জনতার ভিড়! বাধভাঙা গণজোয়ার ঠেলে আমার সৌভাগ্য হয়েছিল তাকে দেখার।

মি. জিন্নাহ রেলওয়ের রুমের তখনকার দিনের সেলুন দরজায় দাড়িয়ে হাত উচু করে জনতাকে সালাম জানালেন। এবং (উর্দুতে) বললেন, *আপ লোক পাকিস্তান চাতে হ্যায়?*

জনতা হাত নেড়ে বলে *হু হু! আমরা পাকিস্তান চাই।*

তখন লক্ষ্য করলাম, তার একচোখে একটা কাচ ফ্রেমের সঙ্গে যুক্ত, তাতে কালো ফিতা বা সুতা ঝুলছে। মনে মনে বললাম, এটা আবার কি ধরনের চশমা!

সময়ের সিড়ি বেয়ে দিন চলে যায়। ক্লাস টেনে *ইংরেজি পার্ট* নামে একটা অধ্যায় ছিল। Important Man of Asia (ইম্পরট্যান্ট ম্যান অফ এশিয়া)। তাতে এশিয়ার একজন গুরুত্বপূর্ণ লোকের কথা বলা আছে। Monocle (মনোকল) পরা জিন্নাহ-র সম্পর্কে লেখা। মনোকল হচ্ছে এক চোখে ব্যবহৃত চশমা বিশেষ যা চোখের চার দিকের মাংসপেশি যথাস্থানে ধরে রাখে।

বুঝতে পারলাম জিন্নাহ কেন এটা পরেছিলেন। তখন তার বয়স তো ষাটোর্ধ।

আমার প্রথম চশমাটা বেশ কিছু দিন ধরে ব্যবহার করলাম, কোনো অসুবিধা হয়নি। বয়স তো বাড়ছে, চোখের দৃষ্টি কমছে আস্তে আস্তে। লেখাপড়া থেকে শুরু করে সব কিছুই অস্পষ্ট, আবছা লাগছে। না, আর নয়, এক্ষুণি ডাক্তার দেখানো জরুরি।

ডাক্তার সব কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে চশমার লেন্স বদলানোর পরামর্শ দিলেন।

লেন্স বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে নতুন ফ্রেমও বদলানো হলো।

এবারের ফ্রেমটা লেটেস্ট মডেলের। টাকাও কম লাগলো না। তাহলে কি হবে! নব্য তরুণ যুবক ভাবতে লাগলাম ঠিক যেন বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা। লেন্স ও লেটেস্ট ফ্রেমের বদৌলতে চেহারার আদলই বদলে গেল।

লেন্স ও ফ্রেম বদলালাম সেপ্টেম্বর ২০০২ সালে। প্রায় ছয় সাত মাস পর মে ২০০৩ সালে পুনরায় চোখের সমস্যা দেখা দিল। ডান চোখের দৃষ্টি সম্পূর্ণ রূপে আবছা, অস্পষ্ট। এবারে আর ডাক্তারের কাছে গেলাম না।

বন্ধু-বান্ধব, ছেলেমেয়ে, শুভাকাঙ্খীদের উপদেশ ও পরামর্শ মোতাবেক ঢাকায় গিয়ে চক্ষু বিশেষজ্ঞ দিয়ে চোখ পরীক্ষা করাবো স্থির করলাম।

রাজশাহীতে লায়ন্স থেকে যে লেন্স লাগিয়েছিলাম সেটা কি ভুল? না যে ডাক্তার চোখ পরীক্ষা করে ব্যবস্থাপত্র দিয়েছিলেন সেটা ভুল?

এসব নিয়ে আর মাথা না ঘামিয়ে ঢাকা যাবার জন্য মনে মনে প্রস্তুতি নিতে থাকলাম।

অর্থনৈতিক কারণে ঢাকা যেতে দেরি হচ্ছে। কতোদিন দেরি করতে হবে? মাহফুজ মেরিন ইঞ্জিনিয়ার, সিংগাপুর থেকে জানিয়েছে শিগগিরই টাকা পাঠাচ্ছে।

এ পর্যন্ত টাকা পৌছেনি। টাকার জন্য অধীর আগ্রহে আছি।

চোখের সুচিকিৎসার অভাবে অনেক সময় ভালো চোখও নষ্ট হয়ে যায় বৈকি? আমার ভাগ্যে কি আছে জানি না। তবে এর মধ্যে টুকিটাকি কাজ করছি আমার আবিষ্কৃত নতুন এক পদ্ধতিতে। আপনাদেরও সাময়িক চশমার লেন্স-এর কোনোরূপ সমস্যা দেখা দিলে যতোদিন ডাক্তার দেখাতে দেরি হবে ততোদিন তা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

এটা হচ্ছে, আপনার পুরনো চশমার ফ্রেমসহ লেন্স যদি থাকে তবে অধুনা সে ফ্রেমসহ লেন্সটা ব্যবহার করছেন, অথচ দেখতে অস্বচ্ছ, তাহলে আপনি পুরনো চশমাটির ওপর সেটি পরে দেখতে পারেন। সাময়িক আপনি দৃষ্টির বিভ্রাট থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারেন।

তবে আপনার ডাবল চশমা পরার কারণে নাতি-নাতনির হাততালি আর হাসি থেকে নিষ্কৃতি পাবেন না।

এরই মধ্যে আইভির, এর আগে তার সুচ পরানো কথা বলেছি। সে শ্বশুরবাড়ি থেকে জামাইসহ আমার বাসায় বেড়াতে এলো। লক্ষ্য করলাম তার চোখে খালেদা জিয়ার মতো বাহারি চশমা। আইভিকে জিজ্ঞাসা করলাম, কিরে, তুই আবার কবে চশমা নিলি?

সে উত্তর দিল, বেশ কিছু দিন।

বললাম সত্যি কি তোর চোখের অসুবিধা, না সুন্দর চেহারাটাকে আরো আকর্ষণীয় করার জন্য।

সে হেসে উত্তর দিল, আর আকর্ষণীয় করে কি হবে, সে কাজ তো হয়েই গেছে।

এ কথা শুনে নাতিজামাই হেসে উঠলো।

বললাম, হা, ঠিকই আছে। বয়স তো থেমে নেই, বেড়েই চলেছে, দেখবে মেঘে মেঘে কতো বেলা হয়ে গেছে।

আইভি সখেদে বললো, অবসর সময়ে ঘরের সোফা, জানালার পর্দায় ফুল তুলতে গিয়ে চোখের কারণে অসুবিধায় পড়ি। সুচের কাজগুলো সব এ বড়ো-থ্যাবড়ো হয়ে যায়।

বললাম, এখন তাহলে বুঝতে পারছিস, না?

ওই যে পাঞ্জাবির বোতাম লাগানোর সময় সুচে সুতা দেয়ার জন্য তোকে ডেকেছিলাম তুই তো এসেই সঙ্গে সঙ্গে সুতা পরিয়ে দিয়ে বলেছিলি, নানাভাই, তুমি এতো সুন্দর চশমা পরেই সুতা পরাতে পারো না। তুই তাহলে এতো সুন্দর চশমা পরে নিশ্চয় খুব সুন্দরভাবে সুচ সুতার কাজ করতে পারছিস?

না নানাভাই, মাঝে মধ্যে লাইন বেলাইন হয় বৈকি?

আইভির উত্তর শুনে সুযোগ পেয়ে গেলাম। বলেছিলাম না?

কি বলেছিল নানাভাই?

বলেছিলাম *এয়সা দিন নাহি রহেগা।* এদিন এভাবেই যাবে না, কালের গতিতে সব কিছুই ম্লান হতে থাকবে।

ঘোড়ামারা, রাজশাহী থেকে

সেলসম্যানশিপ

– টিটন রহমান

বাংলাদেশের প্রচুর সংখ্যক মানুষকে একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর চশমা পরতে দেখা যায়। তাছাড়া পড়াশোনার চাপ এবং সুষম খাদ্য ঘাটতির কারণে চোখের সমস্যায় পড়ে ছাত্র জীবনেও অনেককে চশমা নিতে হয়।

কিন্তু ডাক্তারের কাছ থেকে প্রথম চশমা নেয়ার পরামর্শ পাওয়ার পর অধিকাংশ ক্রেতা তার প্রথম চশমার ফ্রেমটি কেমন হবে, কোন ব্র্যান্ডের হবে, কোন রঙের হবে এসব নিয়ে যে চারটানায় পড়ে এটার জ্বলন্ত সাক্ষী আমি।

আমার এক বন্ধুর চশমার দোকান আছে *সেঞ্চুরি আর্কেড* মার্কেটে। দেশি বিদেশি নানান প্রকারের চশমা ফ্রেমের সমাহারে পুষ্ট দোকানটি।

সম্প্রতি আমার শাশুড়ির চোখের ছানি অপারেশনের পর আমার উপর দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল চশমা কেনার। যথানিয়মে সেই বন্ধুর দোকানে গমন এবং ন্যায্য দামে চশমা ক্রয়।

ব্যাপারটা এখানে শেষ নয়। শাশুড়িকে বিদায় দিয়ে স্বভাববশত দোকানেই আড্ডা দিচ্ছিলাম এবং ফাকে ফাকে চশমা বিক্রির কলাকৌশল দেখছিলাম। দেখে অবাক হয়ে গেলাম যে ফ্রেম আমি কিনেছি এক হাজার টাকায় সেই ফ্রেম কথার চাতুর্যে, বাকপটুতায় একজন ক্রেতাকে ধরিয়ে দিল বাইশশ টাকায়।

আমার খোচা মারা কথা ছিল বন্ধুর প্রতি, এমনি করে প্রতিদিন যদি দুই চার পাচজনকে জবেহ করতে পারো তবে তো প্রতি বছরই একটা করে ফ্ল্যাট কিনতে পারবে।

বন্ধুটির অকপট স্বীকারোক্তি, প্রতিদিন দুই একজন অতি চালাকের গলায় দড়ি দিতে পারি বলেই এখনো খেয়ে পরে বেচে আছি। না হলে ব্যবসায় যা প্রতিদ্বন্দ্বিতা!

চালাকরা ধরা খায় জেনে বিস্মিত হলাম।

পরে বন্ধুটি অনেক বিশ্বাস নিয়ে ব্যবসার কিছু গোপন কৌশল আমার কাছে ফাস করে দেয়।

(সরি বন্ধু, লেখাটি লিখছি বলে কিছু মনে করো না। হাজারো সাধারণ মানুষ যেন প্রতারিত না হয় সেই উদ্দেশ্যেই এ লেখা)।

ব্যাপারটা এমন – সেলসম্যানশিপের অভিজ্ঞতায় প্রথমেই কাস্টমারের জ্ঞান, পকেটের স্বাস্থ্য, প্রথম এসেছে কি না এসব বুঝে নেয়। তারপর কাস্টমার সত্যিই যদি কোনো বেশি দামি ফ্রেম পছন্দ করে বসে, সেটার এমনই কম দাম চায় যাতে দ্রব্যটির মান নিয়ে কাস্টমার বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। তাই বেশি মুনাফা হবে যেটা বিক্রি করলে সেটাকে এমনভাবে উপস্থাপন করবে, দেখাবে, বর্ণনা দেবে যেন কাস্টমার সেটার প্রতি আকৃষ্ট হয়। নিতান্তই কেউ যদি কম দামে হাকানো বেশি দামের চশমাটি কেনার সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে তাহলে খাতাপত্র ঘেটে দাম বলতে ভুল হয়ে গেছে স্বীকার করে ক্ষমা চেয়ে নেয়।

নামি–দামি ব্র্যান্ডের ক্ষেত্রে এসব চলে না বলে বাজারে এমন সব আনকমন নামের ব্র্যাড আছে যেসব দিয়ে ক্রেতাদের সহজেই বিভ্রান্ত করা যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শস্তা দামের ফ্রেম আমদানি করে আকর্ষণীয় নাম কম্পোজ করে নেয়। এক্ষেত্রে আমদানিকারকরাই প্রধান ভূমিকা রাখে। তাই পৃথিবী বিখ্যাত বিভিন্ন চশমা কম্পানির নকল মাল বাংলাদেশের দোকান, বাজার, ফুটপাথে অহরহ দেখা যায়।

আমি চশমাধারী। তবে খুব কম দামের, অথচ সুন্দর ফ্রেম ব্যবহার করি। এবং প্রতি পাচ ছয় মাস অন্তর তা বদলাই।

আমার একজন খুব প্রিয় বান্ধবী বলেছিল – চশমা, ঘড়ি, বেল্ট আর জুতাই ছেলেদের অলংকার। মূলত এসবেই ফুটে ওঠে ছেলেদের ব্যক্তিত্ব, রুচি বোধ। এবং অধিকাংশ ছেলেই তা জানে না বলে একটাই চশমা অথবা ঘড়ি কিংবা বেল্টে কাটিয়ে দেয় বছরের পর বছর।

আমি জানি না অধিকাংশ মেয়ে আমার বান্ধবীর মতের সঙ্গে একমত হবে কি না। তবে তার দ্বারা খুব প্রভাবিত হই বলে চশমা, বেল্ট, জুতা বদলাই সাধ্যমতো।

সম্প্রতি আমি *রাজধানী মার্কেট, ইসলামপুর, নিউ মার্কেট* কিংবা *এলিফ্যান্ট রোডে* কোনো প্রয়োজনে গেলে চশমার দোকানে ঢু মেরেছি। অতি সাধারণ ক্রেতা সেজে দামি ফ্রেমের সন্ধানের ভান করেছি। এতেই নিশ্চিত হয়েছি আমার বন্ধুটির কৌশলের মতোই অধিকাংশ দোকানির কৌশল। এসব করতে গিয়ে মজার সব ঘটনাও ঘটেছে।

একটা ঘটনা বলি।

রাজধানী মার্কেটের এক বিক্রেতা আমাকে প্রায় পটিয়ে ফেলেছে ভেবে এবং আমার চোখে কম দামি ফ্রেম দেখে বললো, ভাই চশমা কিনবেন একবার, বছরের পর বছর চলে যাবে। দামি জিনিসে নিজের ভাবটাও উচু হবে। এই নিন আপনাকে দিলাম দেড় হাজার টাকা দামের চশমাটি মাত্র এক হাজার টাকায়। মাইনাস

পাওয়ারের গ্লাসটির দামও দিতে হবে না। আপনার মাধ্যমে হয়তো আরো কাস্টমার পাবো, তাই এই ছাড়!

আমিও ফ্রেমটি হাতে নিয়ে খুব পছন্দ হয়েছে ভান করে স্বাভাবিক গলায় বললাম, ভাই, দুইশ টাকায় দেবেন? কাচের দামটা আলাদাই দেবো।

বিক্রেতা কপট রাগ দেখিয়ে বললো, ফাজলামো করতে এসেছেন?

আমিও রাগ দেখিয়ে বললাম, ফাজলামি আমি করছি, নাকি আপনি করছেন? দেখুন, জিনিসটার প্রকৃত দাম থেকে আপনি কতো টাকা বেশি চেয়েছেন আর আমি কতো কম বলেছি? আমাকে দেখে কি মনে হয় সদরঘাটে নৌকা বেধে সরাসরি আপনার দোকানে চলে এসেছি?

আমার সঙ্গের বন্ধুটির মিটিমিটি হাসি দেখে দক্ষ দোকানদারের ব্যাপার বুঝতে দেরি হলো না। হাসি মাখা মুখে বললো, বুঝেছি, চশমাটি আপনি নেবেন না। আমাদের বাজাতে এসেছেন। তবে প্রয়োজন হলে আসবেন, সঠিক দাম রাখবো। ভাই, ব্যবসার যা অবস্থা, একটু-আধটু অমন না করলে চলবে কি করে?

আমি বলি, তাই বলে মানুষ ঠকাবেন? তাও ডাবলেরও বেশি দাম!

দোকানি যেন আসামি এমনভাব করে বললো, কসম, গরিব মানুষকে ঠকাই না। এই মার্কেট তো মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্তদের মার্কেট। তাদের ঠকালে মার্কেটের সুনামই শেষ হয়ে যাবে।

দোকানির স্বীকারোক্তি আমার ভালো লেগেছিল। তাই আমার বর্তমান চশমাটি ওই দোকান থেকেই কিনেছি। এটা যে তার সেলসম্যানশিপের দক্ষতার সাফল্য তা জেনেও কিনেছি।

পরিশেষে প্রথম চশমা ক্রয়ে উদ্যোগী পাঠকদের বলছি, বিক্রেতার চটকদার কথায় প্রভাবিত হবেন না। যারা চশমা বিষয়ে অভিজ্ঞ, ক্রয় করতে তাদের কাউকে সঙ্গে নিন অথবা পরিচিত কেউ ব্যবহার করছে এমন প্রতিষ্ঠিত ব্র্যান্ডের চশমা কিনুন। কারণ এসব দ্রব্যের দাম খুব একটা হেরফের হয় না। তারপরও নকল পণ্য বিষয়ে সতর্ক থাকুন এবং ব্র্যান্ডের স্বীকৃত এ.বি.সি গ্রেড বিষয়ে অবহিত হয়ে নিন। একাধিক দোকান যাচাই করুন। বিক্রেতার অযথা রাগের কথায় বিভ্রান্ত হবেন না। টাকা দিয়ে জিনিস কিনবেন। তাই যাচাই করার অধিকারের কথা বিস্মৃত হবেন না। অথবা ঝামেলা এড়াতে ফিক্সড প্রাইসের দোকান থেকে পছন্দ করে কিনুন। এতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে টাকা কিছুটা বেশি গেলেও গলা কাটা যাবে না।

ওয়ারি, ঢাকা থেকে

বরের অশ্রু

– আহসানুল মজিদ লিটন

বিয়েতে কনে কাদে এটা যেন নিয়ম। কিন্তু বর কেদেছে এমন কি হয়! বরের চোখে পানি এমন একটা ঘটনা বলি।

বড় বোনের বান্ধবীর বিয়ে। বর মানে আমাদের দুলাভাই পাইলট সেইফ একটা কালো সানগ্লাস পরে দলবলে বিয়ে করতে হাজির। বিয়েটা হচ্ছে রাতে। সময়টা উপযোগী না হওয়ায় সর্বাধিক আকর্ষণীয় লোকটার চোখে সানগ্লাসটা বড় বেমানান লাগছে। আমার ও বন্ধুদের অনেক আপত্তিকর কথা তিনি কানে না তুলে এক মুহূর্তের জন্যও জিয়াউর রহমান স্টাইল সানগ্লাসটা না খুলে মহা আনন্দে বিয়ে করছেন।

বন্ধুরা পরামর্শ করলাম, আজকের প্রধান অতিথির সানগ্লাস ছিনতাই করবো। পৃ-প্ল্যান অনুযায়ী বরের স্টেজে গিয়ে খাজুরে আলাপ শুরু করলাম। দায়িত্বপ্রাপ্ত চুমকি গিয়ে বসলো বরের পাশে। সুন্দরী শ্যালিকা পেয়ে দুলামিয়া, খুশি খুশি মুখে কথা বলছিলেন। কিন্তু সুযোগ সন্ধানী চুমকি এক পর্যায়ে ছো মেরে সানগ্লাস নিয়ে দৌড়। কিন্তু একি!

বরের যে এক চোখ নেই। তিনি জীবনের এই শুভ দিনে নিজের দুর্বলতা ঢাকতে এই কালো সানগ্লাস পরেছেন। তিনি লজ্জায় দুই হাতে মুখ না লুকিয়ে এক চোখে চেয়ে রইলেন আমার দিকে। কারণ তার ধারণা ভিলেইন আমি। তার ওই একটি চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়তে লাগলো।

নিমন্ত্রিত অতিথিসহ সবাই চুপ। মুহূর্তেই ব্যাপারটা আরো পাচ কান হওয়াই বিয়ে বাড়ির আনন্দ চুলোয় গেল। আমি না খেয়ে বাড়ি ফিরলাম। সারা রাত ঘুম হলো না অনুশোচনায়। পরে জেনেছি কনের পক্ষ থেকে, জেনেশুনেই তার কাছে কন্যা দান করেছেন। কারণ তিনি সব দিক মিলিয়ে সুপাত্র।

এই ঘটনার চোদ্দ বছর পর এখন আমার জন্য পাত্রী খোজা হচ্ছে। কিন্তু বিয়ে করতে আমার ভয় করছে। কারণ ইতিমধ্যে আমার মাথা ভর্তি টাক। ভয় হচ্ছে বিয়ের স্টেজে কেউ যদি আমার পাগড়ি খুলে নেয়! তাহলে যে আমার এক চোখ নয়, দুচোখ দিয়েই পানি পড়বে।

লন্ডন থেকে

litonmunsi@yahoo.com

বাজি

– সামি সারোয়ার হক

এক.

হুমম! বাম চোখটা বন্ধ করো, এবার পড়ো প্রথম থেকে।

ডাক্তারের কথামতো প্রথম তিন লাইন পড়লাম, চতুর্থ লাইনে কিছুই দেখি না।

ডাক্তার বিরক্ত চোখে তাকালেন। কারণ এ রকম কেস নতুন কিছুই না।

প্রতি বছর ক্লাস টুয়েলভ-এর ক্যাডেটরা সামরিক বাহিনীতে যোগ দেয়ার বাধ্যতামূলক ISSB Test থেকে বাচার জন্য চোখ খারাপের ভান করে। কিন্তু আমি সিরিয়াসলি আইএসএসবি দিতে চেয়েছিলাম। তারচেয়েও অবাক করা বিষয় হলো আমার জন্য, আমি নিজেও জানতাম না আমার এক চোখ এতো গুরুতর রকমের খারাপ। কি আর করা আইএসএসবি দেয়া হলো না! কারণ আমি নেভি-তে যেতে চেয়েছিলাম। নেভি-তে যাবার জন্য চোখ একদম ভালো থাকা লাগে। ছুটিতে এসে সিএমএইচ-এর ডাক্তারের কাছে গেলাম ফিরলাম ডান চোখে মাইনাস দুই দশমিক পাচ আর বাম চোখে শূন্য পাওয়ারের চশমার প্রেসক্রিপশন নিয়ে।

দুই.

আবার প্যারাসিটামল খাচ্ছিস? মা জিজ্ঞাসা করলেন খাবার টেবিল থেকে।

হুমম! কি করবো, মাথা ধরেছে প্রচণ্ড। উত্তর দিলাম।

তাই বলে প্রতিদিন দুইটা করে প্যারাসিটামল খাবি? মায়ের আবার সেই এক ঘ্যানঘ্যানানি শুরু হলো। গত এক বছর ধরে তোকে বলছি, চশমা পর, চশমা পর, কে শোনে কার কথা।

আমার চশমা পরতে মোটেও ভালো লাগে না, আমার সেই একই উত্তর।

তোর এই প্যারাসিটামল খাওয়া আর চলবে না। কালকেই ডাক্তার দেখাবি, মা বললেন।

বললাম, দেখিয়ে কি হবে? চশমাই যদি না-ই পরি, পাওয়ার বাড়লেই কি, না বাড়লেই বা কি?

যা বলছিলাম শোন। সেই কবে থেকে চশমা পরিস না, পাওয়ার তো বাড়বেই। প্রথমে চশমা নিলি, তখন বললি চশমার ফ্রেম পছন্দ হয়নি। আর পরেরটা দুই দিন না যেতেই ভাংলি, এখনো দুইটা চশমা পরে আছে বাসায়, পরিস না। এভাবে চালাতে থাকলে দুই চোখই যাবে।

পরের দিন মায়ের হাত থেকে বাচার জন্য গেলাম ডাক্তারের কাছে।

ডাক্তার চোখ পরীক্ষা করে সুসংবাদ দিলেন। বাম চোখ আগের মতোই ভালো আছে। কিন্তু ডান চোখে মাইনাস তিন দশমিক পাচ হয়েছে।
খুশি মনে নতুন চশমার অর্ডার দিয়ে বাসায় ফিরলাম। নতুন চশমা না হওয়া পর্যন্ত মনের আনন্দে প্যারাসিটামল খাওয়া যাবে।

তিন.

তোর সঙ্গে বাজি লেগে লাভ নেই। অনিন্দিতা বললো।
বললাম, কেন?
কারণ তোর সঙ্গে বাজিতে জিতে আমার অনেকগুলো উহশ (Wish) পাওনা আছে। আগে সেগুলো চেয়ে নিই, তারপর বাজি ধরবো আবার।
বললাম তুই বাজি জিতবি, শিওর হচ্ছিস কিভাবে?
অনিন্দিতার উত্তর, তুই এখন পর্যন্ত কোনো বাজি জিতেছিস?
না জিতিনি। কিন্তু এটা জিতবো।
ঠিক আছে, যা বাজি লাগলাম। শর্ত আগের মতোই, যা চাইবো তা-ই পাবো। অনিন্দিতা বললো।
বললাম, ঠিক হ্যায়।
অনিন্দিতা আমার ইউনিভার্সিটির Best friend। তার সঙ্গে প্রায়ই বাজি ধরি। এখন পর্যন্ত কোনো বাজি জিতিনি। আমাদের বাজির শর্ত খুব অদ্ভুত! যে বাজি জিতবে সে যা চাইবে তা-ই পাবে।
যথানিয়মে বাজিতে হারলাম। অনিন্দিতা সাধারণত বাজির শর্তগুলো জমিয়ে রাখে বাংলাদেশের প্রাপ্ত দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের মতো। তাই আমি হেরেও খুশি আমার কোনো শর্তই পূরণ করা লাগবে না।
সেদিনও লাফাতে লাফাতে ইউনিভার্সিটিতে গেলাম দেখি অনিন্দিতা কঠিন মুখ করে বসে আছে। আমাকে দেখেই বললো, গাধা, বাজি ধরতে নিষেধ করেছিলাম মনে আছে?
বললাম, আছে।
তোর এবার বাজির শর্ত পূরণ করা লাগবে।
বুঝলাম, এবার আমার খবর আছে। মুখটা ব্যাজার করে বললাম কি শর্ত?
সে বললো, মুখে বলে লাভ নেই। তোর এখন থেকে সব সময় চশমা পরা লাগবে। আসামিকে ফাসির হুকুম দিয়ে বিচারক বললেন, এখন শেল অ্যান্ড কোর আইসক্রিম খাওয়া।
সেই থেকে চশমা পরা শুরু হলো নিয়মিত আমার। কতোগুলো ফ্রেম ভাঙছি, কতোগুলো চশমা হারিয়েছি এই পাচ বছরে হিসাব নেই। কিন্তু বাজির শর্তটা আজো ভাঙিনি। চশমাটা এখন আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুর সবচেয়ে প্রিয় স্মৃতি।

ইংল্যান্ড থেকে

দুটি প্রজাপতি

– সালেহ

সেদিন বাইরের কাজ সেরে বেলা দেড়টায় বাসায় ফিরি। বারান্দায় গৃলের গেট খুলে ভেতরে ঢুকতেই চোখ পড়ে কোণার দিকে। মনে হলো যেন দুটি প্রজাপতি ডানা মেলে পাশাপাশি বসে আছে টেবিলের ওপর। যে কোনো মুহূর্তে উড়াল দেবে। দ্রুত আলমারি থেকে ক্যামেরাটা নিয়ে আসি। তারপর ধারণ করি সেই স্মরণীয় দৃশ্যটি। না, কোনো প্রাকৃতিক দৃশ্য বা জীবন্ত কোনো প্রাণীর নয়। বস্তুর ছবি মাত্র। টেবিলের ওপর পাশাপাশি রাখা দুটো চশমা। একটি মা-র, অপরটি বাবার।

কেউ কেউ হয়তো ভাববেন, চশমার আবার ছবি তোলার কি হলো!

হ্যা তাই। আমিও একমত। কিন্তু দুটো চশমাকে এভাবে পাশাপাশি দেখে মনে যে অনুভূতি হয়েছিল তাতে মনে হলো এই সুন্দরকে ধরে রাখি।

ছবিটি এখন শুধুই ছবি। কালের আবর্তে একদিন তা স্মৃতি হয়ে যাবে। ভাবতেই ভেতরটা যেন কেমন করে ওঠে।

ময়মনসিংহ থেকে

অপমৃত্যু

– মোহাম্মদ ইকরাম উদ্দিন রিয়েল

তখন সবেমাত্র এসএসসি পাস করেছি। নিজের একান্ত ইচ্ছাতেই জোরারগঞ্জ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সটিটিউট–এ ভর্তি হলাম। কারণ বাড়িতে আব্বুর ঘ্যানর ঘ্যানর ভালো লাগতো না। তাই বাইরে থেকে পড়াশোনা করবো। এবং স্বাধীনভাবে চলাফেরা করবো।

যখন মেসে উঠলাম তখনই বুঝলাম একা থাকা কতো কষ্ট। তবুও কিছুটা ভয়, কিছুটা কান্না যা অবশ্য চোখের পানি ছাড়া। কিছুটা নিজে রান্না করে খাওয়ার কষ্ট। এছাড়া সর্বোপরি বন্ধুদের মাঝে হাসি–আনন্দে প্রথম বছরটা গেল।

এর মাঝে দেখলাম বন্ধুরা কম বেশি সানগ্লাস ব্যবহার করে। এবং রুমমেট মাহমুদুলও চশমা ব্যবহার করতো। তাদের দেখে নিজের মনে সুপ্তবাসনা জাগে যে, চশমা পরবো। কিন্তু কোথায় পাবো টাকা চশমা কিনবো! তখন হাতেও কোনো টাকা নেই।

যাক, বুদ্ধি খাটিয়ে বাড়ি গেলাম এবং কয়েকদিন থাকার পর চলে আসার সময় সেজভাইয়ার ড্রয়ার থেকে সুন্দর কালো গ্লাসের চশমাটা পকেটে নিয়ে নিলাম চুপিসারে। তাছাড়া আব্বুর কাছ থেকে টাকাও নিলাম বিভিন্ন অজুহাতে।

মেসে এসে বন্ধুদের মিষ্টিমুখ করাতে হলো। কারণ এরই ফাকে আবার আরেকজনের মনও চুরি করে ফেললাম মোটামুটিভাবে। কাজটা সহজ হয়েছিল ভাগ্নির জন্য। কেননা আমার প্রিয়া যার ছদ্মনাম সাথী ছিল ভাগ্নিরই প্রিয় বান্ধবী।

এদিকে মনে নতুন রঙ লেগেছে। তাছাড়া চশমাও আছে। কিন্তু চক্ষু লজ্জার জন্য পরতে পারছি না। কোনো রকমে একদিন কলেজে যাওয়ার সময় পরলাম চোখে। বাইরে সব কিছু ঘোলাটে লাগছে। কেমন যেন মেঘাচ্ছন্ন আকাশটা। রাস্তাটা উচু–নিচু মনে হচ্ছে। দূরে যাওয়ার পর মনে হয় রাস্তায় সামনে গর্ত।

কোনো রকমে সাবধানে পা চালিয়ে কলেজে পৌছালাম। এবং সবার বাহবা পেয়ে ভালো লাগলো। কেউ কেউ ঢালিউডের নায়ক বানাতেও ছাড়লো না। এভাবে আমার প্রথম চশমা পরার অভিজ্ঞতা হলো।

কয়েকদিন পর পর চশমা চোখে দিই। নিয়মিত পরছি না আড়ষ্টতার জন্য। হঠাৎ ভাগ্নির কাছ থেকে খবর পেলাম যে, সাথীর সঙ্গে দেখা করতে হবে।

এই খবর পেয়ে ভড়কে গেলাম।

মাহমুদুল ও মুহিতের পরামর্শে পরদিনই অর্থাৎ ৫ মার্চ ২০০২–এ রওনা দিলাম আমরা তিনজনেই। যাওয়ার সময় বাসে দেখলাম ঘনিষ্ঠজন অর্থাৎ মাহমুদুল–এর চোখে শোভা পাচ্ছে কালো সানগ্লাস। আমার কাছেও আছে। তবে আমারটা পকেটে।

যখন নামলাম তখন মুহিত বললো, চশমা লাগাও। না হলে আমাকে দাও।

আমিও রোদের তীব্রতা অনুভব করে চোখে দিলাম চশমাটা। ভাগ্য ভালো যে, ভাগ্নির স্কুলে পৌছেই তাদের পেয়ে গেলাম। বছরের প্রথম দিকে হওয়ায় তখনো পুরোদমে ক্লাস হচ্ছিল না।

আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলার সময় দেখলাম ভাগ্নি হাসছে। আমাকে ডেকে ভাগ্নি বললো, মামা, আপনাকে খুব দারুণ লাগছে তবে...। আর বললো না।

পরে আমাদের জোরাজুরিতে তাদের নিয়ে কাছেই একটি লেকে গেলাম নিরিবিলিতে কথা বলার জন্য।

সাথীকে নিয়ে একটি বেঞ্চির দিকে যাওয়ার সময় চশমাটা খুলে রাখলাম শার্টের পকেটে। সাথী বেঞ্চিতে বসে গেল আর আমি সতর্কতাবশত বেঞ্চিতে যখন একটু ফু দিয়ে ধুলা পরিষ্কার করতে গেলাম তখনই চশমাটা গেল পড়ে। তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে নিতে গিয়ে আমার পায়ে জড়ানো আটশ পচিশ টাকা দামের মহা পরাক্রমশীল জুতা আমেরিকান বাহিনীর ট্যাংক বহরের মতো নির্দয়ভাবে গুড়িয়ে চুরমার করে দিল আমার সাধের সানগ্লাসটা।

যাক, কিছুটা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বসলাম সাথীর পাশে। সাথীকে দেখলাম মুচকি মুচকি হাসছে। প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে পুরনো ডায়ালগগুলো সিনেমার মতো শেষ করলাম দুজনেই অর্থাৎ ভালোবাসার বীজ রোপন হয়েই গেল।

এরপর সাথীই আবার যাওয়ার আগ মুহূর্তে বললো, আপনার মনে হয় মনটা খুব বেশি খারাপ।

বললাম, তা তো একটু খারাপ লাগবেই। তখন মুখে কৌতুক অভিনেতার মতো কৃত্রিম হাসি চালানোর জন্য চেষ্টা করছিলাম। এমনিতেই আমার হৃদয়টা সেই চশমার জন্য হাহাকার করে কাদছিল। তাছাড়া পুরো সময়টা বেচারা চশমা আমার পায়ের তলায় রইলো।

তারপর আবার।

সাথী বললো, একটা কথা বলবো আপনাকে?

বললাম, অনেক কথাই তো বললে, এটা আবার বাকি থাকবে কেন?

সে বললো, চশমাটা ভেঙে গেছে তাতে আমি খুব খুশি হয়েছি। যদিও আপনি মন খারাপ করলেন চশমার জন্য।

আমার এমনিতেই চশমার জন্য দুঃখ আবার তার খুশি দেখে বললাম, তুমি খুশি হওয়ার কারণটা জানতে পারি কি?

সে বললো, তাহলে বললে আবার রাগ করবেন না তো?

বললাম, না।

সাথী বললো, ওই চশমাতে আপনাকে বাদরের মতো লাগছিল। তাই খুশি হলাম চশমাটা ভেঙেছে বলে।

এদিকে আমার অবস্থা কাহিল। তুমি আবার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিলে। বললাম, আমি যদি বাদর হই তাহলে তুমি নিশ্চয় বাদরনী।

মাঝখান থেকে ভাগ্নি এসে বললো, আর আমি বাদরের ভাগ্নি ও বাদরনীর প্রিয় বান্ধবী।

এরপর সবাই আনন্দ নিয়ে বিদায় হলাম। পরে মেসে এসে মনে করেছিলাম আমার জন্মদিনে গিফট পাবো চশমা। কিন্তু পেলাম একটি কার্ড। তাতে লেখা সেই গৎবাধা কিন্তু অতি কাংখিত ভালো লাগার কথা, I love you.

মনটা খুশি, কারণ চশমার অপমৃত্যুতে আমার জীবনের সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কার্ডটি পেলাম।

চট্টগ্রাম থেকে

সযতনে

– পলি নাসরিন

আব্বার কথা খুব একটা মনে নেই। কারণ তিনি যখন চিরদিনের জন্য আমাদের ছেড়ে চলে যান তখন আমি ক্লাস থৃ–র ছাত্রী। তবুও মাঝে মধ্যে মনের গভীরে তার যে ছবিটি ভেসে ওঠে তা কালো ফ্রেমের মাঝে পুরু লেন্সের চশমায় আবৃত এক স্নিগ্ধ মুখশ্রী।

প্রতিদিন বিকেলে আব্বার অফিস থেকে ফেরার সময় হলে আমাদের আদরের নয়নমণি বড় আপার দুই বছরের ছেলের হাত ধরে রেলিংয়ে দাড়িয়ে থাকতাম। আব্বাকে দেখা মাত্র দুজনে দৌড়ে যেতাম আব্বার কাছে। আব্বা তাকে কোলে নিতেই সবার আগে সে আব্বার চশমাটা চোখ থেকে খুলে নিতো। চশমাটা যেন তার আর তার নানাভাইয়ের মাঝে একটা বিরাট প্রতিবন্ধক। এক হাতে আমার হাত ধরে এবং ডলারবাবুকে কোলে নিয়ে আব্বা বাসায় ঢুকতেন।

আজও আম্মার আলমারিতে আব্বার সেই চশমাটা সযতনে তোলা রয়েছে। সেটায় হাত দিলে এখনো আব্বার অস্তিত্ব অনুভব করি।

বিয়ের পর পরই হানিমুনে যাবার দুই একদিন আগে সে তিন চারটা মার্কেট ঘুরে খুব সুন্দর একটা সানগ্লাস কিনে দিয়েছিল, নিজের জন্যও কিনেছিল। তবে সেটা আমারটার মতো সুন্দর ও দামি নয়।

সেদিন তার দেয়া সানগ্লাসের সঙ্গে সঙ্গে তার সুন্দর মনের পরিচয় পেয়ে ভালো লেগেছিল। সানগ্লাসটি আর নেই। তবে সেটা পরে সমুদ্র সৈকতে তোলা ছবিগুলো সযতনে রেখে দিয়েছি যা দেখলে এখনো প্রিয়জনের দেয়া প্রিয় সানগ্লাসটির কথা মনে পড়ে যায়।

আমার দুষ্টু ছেলেটার কাছে সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে, তার বাবার পোশাক পরে আমাকে চমকে দেয়া। সেদিন রান্না করছি, এমন সময় সে তার বাবার পোশাক পরে, বাবার সানগ্লাস চোখে দিয়ে আমার কাছে গিয়ে বললো, আম্মু, তোমাকে একটা ধাধা বলি। বলতে পারবে, *কোন সে শয়তান নাকে বসে ধরে কান*।

রাগ করতে গিয়েও তার চশমা ঘুরিয়ে বলার ধরন দেখে হেসে ফেলি।

সে বলে, পারলে না তো, এটা হলো চশমা।

কোর্টগাও থেকে

মেমসাহেব

– এম.ডি সাব্বির

একদিন আমার অফিস ছুটির পর বাসায় ফেরার পথে রিকশা ঠিক করার জন্য ফুটপাথ থেকে নেমে দাড়াই। এমন সময় এক রিকশা পেছন থেকে আমাকে ধাক্কা দিল। রিকশাচালককে কিছু বলতে যাবো এমন সময় আমার চোখ চলে যায় যাত্রীর পায়ের দিকে। দেখলাম মহিলা যাত্রী। তাই চালককে কিছু না বলে ছেড়ে দিলাম। তারপর অন্য রিকশা ঠিক করে রওনা দিলাম। বাড়ি থেকে পাচ মিনিটের পথ বাকি। হঠাৎ দেখি সামনে বিশাল ট্রাফিক জ্যাম। তাই রিকশা থেকে নেমে হাটা শুরু করলাম। কিন্তু লক্ষ্য করলাম পাড়ার পরিচিত সবাই কেমন করে আমার দিকে তাকাচ্ছে।

তাদের সবার দৃষ্টি উপেক্ষা করে বাসায় ঢুকতেই ভাবী দুই একবার দেখে উচু স্বরে প্রশ্ন করলেন, সৈকত, তোর কি হয়েছে, কে করেছে তোর এ অবস্থা।

বললাম, কই, কি হয়েছে। ভাবী বললেন, তোর পা কেটে রক্ত পড়ছে।

তারপর কি তুলকালাম কাণ্ড।

এর পরদিন যেন অফিস যাওয়া বন্ধ হওয়ার উপক্রম। তাও অনেক কষ্টে ভাবী ও মাকে বুঝিয়ে অফিসে এলাম। সেদিন আবার অফিস ছুটির পর রিকশার জন্য দাড়িয়েছি।

কিছুক্ষণ পর পেছন থেকে একে মায়াবী নারী কণ্ঠে শুনলাম, এক্সকিউজ মি।

পেছন ফিরতেই দেখি হালকা সবুজ শাড়ি ও চশমা পরা এক স্বর্গের রাজকন্যা। এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছি।

বাস্তবে ফিরে এলাম তার কথায়, কেমন আছেন?

তার কথার উত্তর না দিয়ে স্বাভাবিক হয়ে প্রশ্ন করলাম, আপনি?

তারপর মেমসাহেব যা বললেন তার মর্মার্থ এই– গতকাল যে রিকশাটা আমায় অ্যাকসিডেন্ট করে সেটি তাদের প্রাইভেট রিকশা এবং আমাকে বেশি ব্যথা পেতে দেখেও রিকশাচালককে কিছু বলিনি বলে সে কৌতূহলী হয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছে।

এরপর তার সঙ্গে কিছু কথা হলো এবং তার অনুরোধে রিকশায় চড়ে বাসার কিছু সামনে নেমে গেলাম। অবশ্য রিকশায় চড়ার সময় তার পরিচয়টা জেনে নিলাম যেমন নাম, ঠিকানা, কোন কলেজে পড়েন ইত্যাদি।

মেমসাহেবও আমার সম্পর্কে কিছু জেনে নিলেন।

তারপর থেকে আমাদের মাঝে মধ্যে দেখা হয়, কথা হয়। আমাদের সম্পর্ক গভীর হয়ে আপনি থেকে তুমি তে আসে। আস্তে আস্তে শুরু হয় ভালো লাগা। ভালো লাগা থেকে ভালোবাসা। দুজন বিভিন্ন ছুটির দিন এক সঙ্গে কাটাই। এভাবে কেটে যায় দীর্ঘ তিন বছর। এর মধ্যে তার বড় বোনের বিয়ে হয়েছে, আমারও বিয়ের কথা চলছে।

এক শুক্রবার বিকেলবেলা পার্কে আমি ও মেমসাহেব বসে আছি। ওই দিন মেমসাহেবকে কাজ করা শাদা ড্রেস ও চশমাতে দারুণ লাগছিল। অনেক কথার পর তাকে চমকে দিয়ে বলি, কাল তোমার বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠাবো।

সে কিছুক্ষণ মাটির দিকে তাকিয়ে তারপর আমার হাত তুলে নিয়ে একটা আলতো চুমু দিয়ে প্রায় দৌড়ে রিকশায় উঠে চলে যায়।

বেশ কিছুক্ষণ মূর্তি হয়ে তার পথের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কারণ কোনো মেয়ের কাছ থেকে পাওয়া এটায় ছিল আমার প্রথম চুমু।

ওই দিন ভাবীকে অনেক কষ্টে পটিয়ে ভাবীর মাধ্যমে মাকে জানালাম। তারপর তাদের বাসায় ঘটক পাঠানো হলো।

এর দুই সপ্তাহ পর মা-বাবা, ভাবী ও বড় বোন তাকে দেখতে গেল।

এর মাঝে তার সঙ্গে দেখা করিনি।

ওই দিন অনেক টেনশন করে অফিস থেকে ফিরে ভাবীকে একদিকে নিয়ে জানতে চাইলাম, খবর কি?

ভাবীর কথা শুনে আমার মনে হলো আমার পায়ের তলায় মাটি নেই। ভাবী জানালেন, মা নাকি তার চোখে চশমা দেখে এক সেকেন্ড দেরি না করে তাদের বাসা থেকে বেরিয়ে চলে এসেছেন। মায়ের ধারণা, আমার চশমা পরা মেমসাহেব চোখে কম দেখে। কিন্তু মা জানেন না তার সৌন্দর্য হাজারগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে তার চশমা।

অনেক বলেও মাকে আর রাজি করানো যায়নি। মন ভালো না থাকায় দুই দিন অফিস যাইনি। তৃতীয় দিন অনেক পরিকল্পনা করে অফিস যাই। অফিস থেকে তার কলেজ ছুটির আগে ছুটি নিয়ে তার কলেজে গিয়ে তার খোজ করি। ভাগ্যক্রমে সে আমাকে দেখে ফেলে।

মেমসাহেব আমার কাছে আসে এবং কাছের পার্কের এক নির্জন জায়গায় নিয়ে হঠাৎ করে আমার বুকে মুখ লুকায়। এভাবে অনেকক্ষণ কান্নাকাটি করার পর আস্তে আস্তে বলে, বাবা মায়ের মত ছাড়া কিছু করো না। কারণ তারা তোমার সবচেয়ে আপনজন। তাদের মনে দুঃখ দিও না।

আমি বোবা হয়ে তার কথা শুনেছি। কিন্তু নিজের জমানো কথা কিছুই বলতে পারিনি।

তারপর মেমসাহেব তার চশমাটা চোখ থেকে খুলে আমার হাতে দিয়ে বলে, শেষ উপহার, আমাকে ভুলে যেও, আর কোনোদিন আমার খোজ করো না। কথা শেষ করে সে চলে গেল আর খোজ নেয়নি।

এর বেশ কিছু দিন পর বাবা-মায়ের মতে বিয়ে করলাম। কিন্তু সে ভুলতে বললেও তার চশমাটা চোখের সামনে পড়লে তার কথা মনে পরে। তার শেষ উপহার এমন করে রেখেছি যেন আমার হৃদয়ে রাখা হয়েছে। যে স্থান আমার স্ত্রীকেও দিইনি। এভাবে তাকে ভালোবেসে যাবো আজীবন। জানি না মেমসাহেব আজও চশমা পরে কি না।

মাদারবড়ী, চট্টগ্রাম থেকে

নীল মেঘ

– শাহানারা শিপা

মেঘলা আমার কয়েকজন বান্ধবীর মধ্যে একজন। কলেজের প্রায় শেষের দিকে তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। মেঘলা আর পাচটা মেয়ের থেকে একটু আলাদা। আমি যখন তার সঙ্গে কথা বলি তখন মনে হয়, মেঘলা পৃথিবীর সব কিছু ভালোবাসে। তারপরও তাকে নিঃসঙ্গ মনে হয়। হয়তো এ জন্যই মেঘলাকে আমার পছন্দ হয়।

সে কলেজে কোনো ছেলের সঙ্গে কখনো কথা বলেছে কি না সন্দেহ। প্রশ্ন করাতে সে প্রায়ই বলতো, আমার মতো কালো পেতনির সঙ্গে কে কথা বলবে!

এরপর আমি আর কোনো প্রশ্ন করিনি এই সম্পর্কে।

আমি আর মেঘলা একই রুমে থাকতাম। ও পড়াশোনায় মোটামুটি ভালো। মাঝে মধ্যে লক্ষ্য করতাম পড়াশোনার ফাকে বেশ কয়েকবার চোখ ধুয়ে আসে। আমি তাকে অনেক বলেছি, দেখ মেঘলা, তুই ডাক্তারকে দেখিয়ে চোখে চশমা পরতে পারিস।

তখন সে অন্য প্রসঙ্গে চলে যেতো।

এর কিছু দিন পরে সে একটা শুভেচ্ছা কার্ড আর একটা চিঠি দেখালো।

জিজ্ঞাসা করলাম, এগুলো কে দিয়েছে?

চিঠিতে এমন কিছুই ছিল না শুধু তার জীবনের মঙ্গল কামনা ছিল বেশি। আর কার্ডের ওপরে লাভ চিহ্ন আকা ছিল। তখন মেঘলা আমাকে যা শোনালো তা শুনে মনে হলো মাটির নিচে চলে গেলাম।

অবাক হলাম তার কথা শুনে। তাকে দেখে বোঝাই যায় না তার জীবনে এমন ঘটনা ঘটতে পারে। মেঘলা তখন আমাকে বললো, তানভীর ছিল ছেলেটির নাম। সে তাকে *নীল* বলে ডাকাতো। মেঘলার কেমন জানি মামা এবং মামির বাসায় নীল থাকতো। নীল দেখতে নাকি সুন্দর ছিল। সবাই প্রায় তাকে পছন্দ করতো। মেঘলা আমাকে বলতো, জানিস, নীলকে আমার প্রথম পছন্দ হতো না। তাকে দেখলেই বোকা বোকা মনে হতো। তারপরও সে আমার থেকে প্রথমে খারাপ ছাত্র ছিল। কিন্তু অধ্যবসায় আর পড়াশোনার জন্য সে আজ অনেক দূর এগিয়ে। এরপরও নীল ছিল তার বাবার প্রথম সন্তান। তারা ছিল দুই ভাই। ওদের আর্থিক অবস্থা ভালো। বাড়িতে পড়াশোনা করে না বলে তাকে এই জায়গায় আসতে হয়েছে। নীল সম্পর্কে মেঘলার ভাই হতো।

নীল চশমা পরতে আরম্ভ করে ক্লাস নাইনে থেকে। মাথার সামান্য সমস্যার জন্য তাকে চশমা পরতে হতো। চশমাতে তাকে দারুণ লাগতো। তার চশমা ছিল হালকা নীলচে আভা। মেঘলার ভাষ্য মতে, ওই থেকেই তাকে নীল নামে ডাকতো। মেঘলাকে নীলই আগে ভালোবাসতে থাকে। কিন্তু কখনো সরাসরি বলেনি।

মেঘলার কণ্ঠ শুনে অবাক হলাম। ও কাদছে আর বলতে লাগলো, আমিও তাকে একটু একটু করে ভালোবাসতে থাকি। এরপরও কেউ কাউকে বলতে পারিনি সেই চিরন্তন বাণী *আমি তোমাকে ভালোবাসি।* তারপরও দুজন দুজনকে ছাড়া কেমন একা একা লাগতো।

সব সময় না হোক দিনে অন্তত একবার আমাদের দেখা হতো। জানিস, আমি অনেকবার নীলকে বলেছি তুমি হয়তো আমাকে পছন্দ করো না তার কারণ একটিই, আমি দেখতে সুন্দর না।

এতে নীল শুধু একটি কথা বলতো, শুধু গায়ের চামড়া দেখে সব কিছু হয় না।

এর মধ্যে আমাদের দুজনের মাঝে অনেক ঘটনা ঘটে যায়। একদিন তার ছবি দেখতে গিয়ে দেখি একটা মেয়ে তার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে ছবি তুলেছে।

জিজ্ঞাসা করায় বললো, আমার ফুপু।

এরপরও আমি তাকে কিছুই বলিনি। আমাদের বাড়ির পাশে একটা মেয়ে এসে সব সময় নীল সম্পর্কে অনেক কথা বলতো।

একদিন এমনি জিজ্ঞাসা করি, আস্থা, তুই তো তার সম্পর্কে অনেক কিছুই জানিস, বলতো নীল কাউকে ভালোবাসে কি না।

সে এর উত্তর দিল হ্যা আমি জানি তাদের বাড়ির পাশে তিথিকে ভালোবাসে।

বললাম, তুই কি করে জানলি। ও বললো আমার কাছে একদিন একটা চিঠি দিয়েছিল তিথিকে দেয়ার জন্য। তখন সত্যি আমার এতো খারাপ লেগেছিল যে, ইচ্ছা হতো আত্মহত্যা করি।

এরপর নীলকে সব সময় অন্য রকমভাবে দেখতাম। মনে হতো নীলের চশমার নীলচে আভা সব মেয়েকেই গ্রাস করতে পারে। আমি কালো বলে নীল আমার কাছে বাড়তি সুযোগ খুজেছিল। তারপর থেকে নীলের সঙ্গে আমার যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। নীল পড়াশোনার জন্য চলে যায় অন্য জায়গায়। আমিও চলে আসি এখানে। এখান থেকে প্রথমে বাড়ি গেলে এখনো সবার মুখে নীলের প্রশংসা শুনি।

নীল নাকি মাঝে মধ্যে আমাদের বাড়িতে আসে, আমার খোজ নেয়। আমার ঠিকানা চায়, একটা ছবির জন্য অনেকবার এসেছে আমাদের বাড়িতে। আমার নিষেধ থাকায় কেউ দেয়নি।

নীল আজো জানে না তাকে আমি আগের মতো বিশ্বাস করি না। তার চোখের নীলচে আভায় হয়তো আমার মতো অনেকে জ্বলছে। এরপরেও আমি নীলকে ভুলতে পারিনি। কোনো ছেলেকে চশমা পরা দেখলেই মনে হয় তার কথা।

মেঘলাকে বললাম, আর এ জন্যই তুই ছেলেদের সঙ্গে কথা বলিস না।

তখন মেঘলা আমার দিকে অশ্রুসজল দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, নীলের জন্য আমার হৃদয়ের সমস্ত আনন্দ নীল বেদনায় ছেয়ে গেছে। আমি এখন কাউকে ভালোবাসতে পারি না শুধু নীল ছাড়া। নীল যে আমার প্রথম প্রেম। আমি অপেক্ষায় থাকবো নীলের জন্য। নীলের চোখের নীলচে চশমার আভায় দেখতে চায় শুভ্র পবিত্র ভালেবাসা যেখানে কোনো লোভ নেই।

এরপর মেঘলাকে প্রায় প্রতিদিনই *নীল মেঘ* বলে ডাকতাম।

মেঘলার সঙ্গে অনেক দিন আমার দেখা হয় না। আমি জানি না তাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি শেষ হয়েছে কি না? রাস্তা দিয়ে কোনো সুদর্শন ছেলে চশমা পরা দেখলেই আমার মনে পড়ে যায় মেঘলার কথা।

হয়তো দুজনই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এক সঙ্গে সংসারও করছে। তাদের মধ্যে হয়তো চশমার নীলচে আভার মতো কোনো সন্দেহ নেই। হয়তো তারা সুখেই আছে।
হঠাৎ চশমা সংখ্যায় লেখার আহ্বানে মনে পড়ে গেল আমার কলেজ জীবনের এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর কথা যার সঙ্গে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকতাম, কথা বলতাম হৃদয়ের। আজ আমার সেই নীল মেঘ বান্ধবীর থেকে আমি কতো দূরে! হয়তো সেও আমাকে নিয়ে ভাবে আমার মতো।

রাজশাহী থেকে

বিয়েতে

– এবিএম ময়নুল ইসলাম শামীম

১৯৯৮ সালে আমার এইচএসসি পরীক্ষার মাত্র তেরো দিন আগে ছোট আপার বিয়ের দিন ধার্য হলো। তার বিয়েকে কেন্দ্র করে অনেক আনন্দ করার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও পরীক্ষার জন্য হলো না। তার ওপর ভাইয়া আগেই বলে দিয়েছেন, বিয়ের একদিন আগে বাড়ি আসবি। তখন আমি ঢাকা কুর্মিটোলা বিএএফ শাহীন কলেজে পড়ি।
এদিকে ছোট আপার বিয়েতে তাকে ভালো ও দামি একটা উপহার দেয়ার ইচ্ছে ছিল অনেক আগে থেকেই। কিন্তু সেই মুহূর্তে হাতে তেমন টাকাও নেই আর বাড়তি টাকা বাড়ি থেকে নিতেও পারছি না। সাধ্যের মধ্যেই ভাবতে লাগলাম ছোট আপা কোন জিনিসটা খুব বেশি পছন্দ করেন। তখন মনে পড়লো ছোট আপার অটো সানগ্লাসের প্রতি একটা দারুণ দুর্বলতা আছে। যে চিন্তা সেই কাজ।
একটা দামি ও সুন্দর অটো সানগ্লাস কিনে বিয়ের দুই দিন আগে বাড়ি গেলাম। বিয়ের দিন খুব ব্যস্ত থাকার কারণে বিয়ের আগের রাতে আপাকে আমার কেনা সানগ্লাসটা গিফট দিলাম।
তিনি মহা খুশিতে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, আমার বিয়ের সবচেয়ে সুন্দর গিফটটা আমাকে দিলি।
আজও যখন ছোট আপার চোখে সেই চশমাটা দেখি তখন মনে পড়ে সেই রাতের কথা।

বিরামপুর, দিনাজপুর থেকে

মেসে ও জেলে

– মাহবুবুর রহমান ভূইয়া মনজু

কাহিনীটা আশির দশকের শেষ দিকের। স্বৈরাচারী এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে সারা দেশ তখন টালমাটাল। সদ্য মাস্টার্স পাস করে একটা প্রাইভেট ফার্মে ঢুকেছি একদম নামমাত্র বেতনে। যা পেতাম তা দিয়ে ঢাকা শহরে থাকা এবং খাওয়া চলতো।
মালিবাগ মোড় দিয়ে পূর্ব–দক্ষিণে যে রাস্তা ঢুকেছে সেটাই হলো শান্তিবাগ–শাহজাহানপুরের রাস্তা। এই শান্তিবাগের ছোট এক রুমে এক মেসে থাকতাম। মেস মালিক থাকতেন দোতলায়। পেশায় ভদ্রলোক উকিল। সদরঘাট সংলগ্ন কোর্ট–কাছারির নিত্যআইনের ফেরিওয়ালা। বাসায় ডিগ্রি পড়ুয়া একমাত্র মেয়ে ও ক্লাস সেভেন পড়ুয়া ছেলে। আর মতিঝিল হাই স্কুলের শিক্ষয়িত্রী সহধর্মিণী নিয়ে তার ছোট অথচ পরিচ্ছন্ন সংসার।
একদিকে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে রাজপথ উত্তপ্ত, সারাক্ষণ ধরপাকড় চলছে। অন্যদিকে সীমিত আয়ের কারণে বাইরে ঘোরাঘুরি আমার হতো না। তাই অফিস ছুটি হলেই সোজা মেসে চলে যেতাম। প্রায়ই মেসে ঢুকতে ভদ্রলোককে দেখতাম দোতলায় পায়চারী করছেন অথবা চেয়ারে বসে চিন্তা করতেন।

আমাকে দেখলেই নিচে চলে আসতেন বাইরের খোজখবর জানতে চাইতে। বিশেষ করে আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার খবরাখবর। বেচারা আবার ওই দলের ঘোরতর সমর্থক ছিলেন। তাই কথা বলতে সাবধান থাকতে হতো মুখ ফসকে হাসিনা বিরোধী কোনো কথা যেন না বের হয়।

টুকটাক আলাপের ফাকে তার ছেলের পড়ালেখার খবর নিতাম।

তিনিও আমার খোজখবর নিতে কার্পণ্য করতেন না।

ছোটবেলা থেকে চোখে একটা না একটা ফ্যাশনেবল চশমা পরতাম। আমার চাকরি হওয়ার খবর শুনে তখন আমার এক প্রবাসী চাচা আমার জন্য একটা দামি সানগ্লাস পাঠিয়েছিলেন। সানগ্লাসটার আয়না হালকা নীল আর সোনালি কম্বিনেশনের ছিল। এটা রোদে পড়লে শাদা রঙ ধারণ করতো। এটা প্রায়ই বাইরে গেলে চোখে পরতাম।

মেস মালিক আমার এ চশমার ভুয়সী প্রশংসা করতেন।

ভদ্রলোককে চাচা ডাকতাম। চাচার অনুরোধে মাঝে মধ্যে চাচার ছেলেকে পড়ালেখার খুটিনাটি দেখিয়ে দিতাম। এগুলো আমার মেসে বসেই হতো। আমি কখনো দোতলায় যেতাম না। কারণ চাচি শিক্ষিকা, বেশ রাশভারী মহিলা, দেখতেই ভয় লাগতো।

ছেলেটাকে পড়াতে গিয়ে ফাকে ফাকে তার কাছে তার রিমাআপুর খবরাখবর নিতাম। ছোট ভাইয়ের কাছে সেও মাঝে মধ্যে পণ্ডিতমশাই এই আমার খুটিনাটি খবর নিতো। কখনো সামনে আসতো না। তবুও কলেজে যাওয়ার সময়ে সকালে সিড়ির গোড়ায় দেখা হতো। আড়চোখে চাওয়া-চাওয়ি হতো, কথা হতো না। সেও পুরু লেন্সের চশমা পরতো। তাই সামনা-সামনি হলে প্রায়ই খেয়াল করতাম সে আমাকে নয়, বরং আমার চশমা নিয়ে চিন্তিত ছিল। বুঝতাম আমার চশমা ছুয়ে দেখতে তার মনে না বলা ইচ্ছা জাগতো।

আমিও একদিন চশমা ধুয়েছি বলে দোতলায় শুকাতে দেয়ার কথা বলে ছাত্রের হাতে দিলাম। পরে আমার ছাত্রের কাছে শুনেছিলাম রোদে শুকায়নি, বরং তার রিমাআপু চোখে লাগিয়ে অব্যক্ত সাধ পূর্ণ করে শুকিয়েছেন।

ছাত্রের মুখে ঘটনা শুনে রিমার জন্য মনটা উদাস হয়ে যেতে থাকলো। ভালোবাসার হালকা উদারতা এমনি আমার মনকে ছেয়ে গিয়েছিল যে, মন বলতো, রিমা যদি চশমাটা আমার কাছ থেকে চাইতো তো একেবারেই দিয়ে দিতাম।

দিন, সপ্তাহ করে মাস পেরিয়ে চলতে থাকলো। রিমার ডিগ্রি পরীক্ষা আসন্ন হওয়াতে তার আর দেখা-সাক্ষাৎ পেতাম না। কেন জানি মনে শংকা টের পেলাম। রিমার পরীক্ষা শুরু হতেই তার গ্রামের এক খালাতো ভাই বাসায় এসে হাজির। দোতলায় বেচারার ঠাই হলো না। শিক্ষিকা খালা এ আপদকে বাসায় রাখতে নিরাপদ ভাবলেন না। আবার আপন বোনের ছেলে, কিছু বলতেও পারছেন না। সিদ্ধান্ত নিলেন নিচের ঘরে অর্থাৎ মেস মেম্বারের সঙ্গে থাকবে।

প্রথম প্রথম তার কিছু কিছু আচরণ আমার কাছে অদ্ভুত ঠেকতো। যেমন তার চাল-চলন, বেশ-ভূষা ছিল নিত্য ঈর্ষণীয়। বেকার হলেও পোশাক-আশাকে সব সময় ফিটফাট থাকতো। আর প্রায়ই আমার চারপাশে, এমনকি পাশের বাসায় বিভিন্ন জিনিস চুরি হতো শুনতাম।

নিজে যখন ঠিক আছি, ওসব নিয়ে আমার ভাবনার কিছু ছিল না। কিন্তু আশ্চর্য হতাম যখন শুনতাম তার মুখে আজগুবি গল্প আর কল্পকাহিনী। যেমন তার খালু তার বাবার কাছ থেকে ধার নিয়ে এই বাড়ি বানিয়েছে অথবা রিমার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে ছোটবেলায় তার বাবা এবং খালুর সম্মতিতে ইত্যাদি।

এসব কাহিনীর শুধুই শ্রোতা হতাম, প্রমাণ চাইতাম না। মনে মনে তাকে সন্দেহ করলেও কিছু বলার ছিল না।

আমার সন্দেহ অবশেষে সত্যি হলো। কিন্তু ততোক্ষণে করার কিছু ছিল না।

একদিন অফিস থেকে এক আত্মীয়ের বাসা হয়ে মেসে ফিরতে দেরি হয়ে যায়। মেসে ফিরেই দেখি সে ঘুমে আছে ক্লান্ত শরীর নিয়ে।

আমিও সে রাতে না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। খুব সকালে মেস মালিকের স্ত্রীর আর্তনাদ শুনে ঘুম ভাঙে। কি হলো দেখতে দোতলায় গেলাম। হায় হায়! চাচির ভাগ্নে চাচির লোহার সিন্ধুক ভেঙে সোনা-গয়না, টাকা-পয়সা সব নিয়ে পগার পার। নিজের মনকে বোঝালাম। যাক, খালা-ভাগ্নের মামলা, আমরা তো বাচলাম। কিন্তু একি! রুমে ঢুকে আমার চোখ তো চড়কগাছ। টেবিলের ওপর থেকে আমার শখের দামি সানগ্লাসটা কই?

শোকে ক্ষোভে পাথর হয়ে বসে রইলাম। এর মধ্যে চাচা আর তার মেয়ে রিমা নিচে নেমে এসেছে মেসে কারো কিছু খোয়া গেল কি না দেখতে। চাচা আমার অবস্থা বুঝে মাথায় হাত রাখলেন, রিমা নিশ্চুপ দাড়িয়ে আছে। তার চোখের কোণায় পানি চিকচিক করছে। জানি না সেটা আমার সানগ্লাসের শোকে, নাকি আপন খালাতো ভাইকৃত কুকর্মের জন্য লজ্জায়?

তাদের কিছু বলতে পারলাম না। কাপড়-চোপড় পরে তাদের সামনে থেকে অফিসের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেলাম। অফিস শেষে বিকেলবেলায় মনটা হালকা করতে নয়া পল্টন পেরিয়ে বিজয়নগর ধরে পুরানা পল্টনের দিকে হাটতে লাগলাম। কিছু দূর এগোতে গিয়ে পুলিশি ধাওয়ার মুখে পড়লাম। কিছু না বোঝাতে দৌড়াতে পারলাম না। অবশেষে ধরা পড়লাম।

ধরা খাওয়া অনেকের সঙ্গে আমাকেও পুজন ভ্যানে উঠিয়ে নিয়ে গেল। প্রথমে মালিবাগ সিআইডি অফিস, সেখান থেকে গভীর রাতে রংপুর সেন্ট্রাল জেলে। জেলে গিয়ে জানলাম পুলিশি ধাওয়া খাওয়ার আগে স্বৈরাচার বিরোধী মিছিলের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়েছে এবং সেখানে নূর হোসেন নামে বুকে-পিঠে স্বৈচারার বিরোধী শ্লোগান লেখা একটা ছেলে নাকি পুলিশি ফায়ারে মারা গেছে।

জেলে বেখবর কাটালাম তিন মাস। স্বৈরাচারী এরশাদ অবশেষে ক্ষমতা ছাড়লো বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের কাছে। ঢাকার শহরে শান্তিবাগের মেসের কথা ভুলে গেলাম। সোজা চলে গেলাম নিজ গ্রামের বাড়ি ফেনী জেলার মালিপুরে।

বাড়ি এসে দেখি সবাই তো হতবাক, আমি বেচে আছি। বাড়িশুদ্ধ আমার কোনো খবর না পেয়ে আমার ট্রাংক যেটা মেসে আমার একমাত্র সম্বল ছিল সেটা ভেঙে দরকারি সার্টিফিকেটগুলো কুরিয়ার সার্ভিসে আমার গ্রামের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেই। তাই বাড়ির সবাই ধরে নিয়েছিল হয়তো আমি নেই। ঢাকার কর্মস্থলে আর ফিরলাম না। কারণ বেসরকারি ফার্মে আমার চাকরি এতোদিনে থাকার কথা নয়।

অবশেষে ১৯৯১ সালে বিএনপি সরকার গঠন করলে ঢাকায় ফিরে আসি এবং পুরনো কর্মস্থলে এক সহকর্মীর সহায়তায় আবার একটা চাকরিতে ঢুকি। সে থেকে অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে আজো ঢাকায় আছি। কর্মচঞ্চলতার ফাকে বিভিন্ন আধুনিক অত্যাধুনিক মার্কেটগুলোতে খুজে ফিরি প্রবাসী চাচার দেয়া হারিয়ে যাওয়া সানগ্লাসটা। অনেক দিন আগের কথা বলে সানগ্লাসের ব্র্যান্ড নামটা ভুলে গেছি। সেই সানগ্লাসটা তো দূরের কথা, অনুরূপ কোনো সানগ্লাস আজো পাইনি।

তাই প্রিয়া হারানো শোকের মতো আর চোখে পরা হয়নি আজো সানগ্লাস। জানি না শান্তিবাগের মেস মালিক তার শ্যালিকার ছেলের খোজ পেয়েছিলেন কি না?

ঢাকা থেকে

বুলবুলি নীরব

- নার্গিস বনে

১৯৯৫ সালে এইচএসসি পাস করে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে সায়েন্স ফ্যাকাল্টির নিচের দিকে একটা বিষয়ে ভর্তি হই। কিন্তু এতে খুশি ছিলাম না। বুয়েটে পরীক্ষা দিই। সেখানে অপেক্ষমাণ তালিকায়। ভাবছিলাম সেখানেই চলে যাবো। ইতিমধ্যে সেই সর্বনাশী চশমাওয়ালী আমার জুনিয়র ব্যাচে ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়। ফার্স্ট ইয়ারে আসার পরই বন্ধুরা ফাজলামো করে খুজি কোন মেয়েটা সুন্দর, একেকজন একেকটা পছন্দ করি। কিন্তু আমার চোখে সত্যি সত্যি আটকে গেল এই চশমাওয়ালী। আমার ইয়ার থেকে ওদের সঙ্গে পুনঃভর্তি হয় একটা মেয়ে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি, এই চশমা পরা মেয়েটির নাম কি?

সে আমাকে নাম না বলে সরাসরি তাকে গিয়ে বলে ওই ছেলেটা তোমাকে পছন্দ করে।

সে আমাকে তার চোখের ভাষায় কি বুঝিয়েছে আমি জানি না। কিন্তু ধরে নিই সেও আমাকে পছন্দ করে। লজ্জা, দ্বিধা এবং ভয়ে জীবনে কোনোদিন কোনো অপরিচিত মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে পারিনি। চশমার ভেতর তার চোখগুলো ছিল অত্যন্ত ধূর্ত। তার সঙ্গে কথা বলতে পারিনি।

বুয়েট অথবা ঢাকা ইউনিভার্সিটি এই দোটানায় পড়ে ইতিমধ্যে ফার্স্ট ইয়ারে ফেল করে বসি। বিপর্যস্ত হয়ে পড়ি। অনেক চেষ্টায় চার মাস পর এই শর্তে সেকেন্ড ইয়ারে উত্তীর্ণ হই যে আমাকে ফার্স্ট ইয়ারের সব পরীক্ষা আবার দিতে হবে। ফলে আমাকে ফার্স্ট এবং সেকেন্ড ইয়ারের এক সঙ্গে পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। জীবনের ওপর ঘৃণা চলে এসেছিল। ভাবছিলাম আর দেশে থাকবো না। কিন্তু এই চশমাওয়ালীর জন্য পারিনি। এখানেই থাকি।

অনার্সে শতকরা সাতান্ন ভাগ নাম্বার পেয়ে সেকেন্ড ক্লাস পাই। তাকে যে কেন এতো ভালোবেসে ফেললাম তা বলতে পারবো না। কিন্তু এটুকু বলতে পারি, তাকে ভালোবেসে অন্তত মনের মাধুরী দিয়ে সাজিয়ে আমার জীবনকে রক্ষা করতে পেরেছি। একটা সময় এমন হয়েছিল যে, শুধু তার জন্যই ডিপার্টমেন্টে যাই, লেখাপড়া করি।

পরবর্তীকালে আমার পছন্দের যথার্থতা প্রমাণ পেয়েছি। সে ছিল একজন স্ট্যান্ড করা মেয়ে, অত্যন্ত ভালো উপস্থাপক, আবৃত্তিকার এবং তার্কিক। যার এতো গুণ তার কাছে যাবার সাহস আমার হচ্ছিল না। তাকে শুধু ভালোবেসেছিলাম আর মুগ্ধ হয়ে দেখেছিলাম। কতোটুকু মুগ্ধ হয়েছিলাম তা বোঝাতে পারবো না। তবে শুধু এটুকু জানি যে, পৃথিবীর অন্য সব কিছু ম্লান হয়ে গিয়েছিল।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের *আমি দূর হতে তোমারেই দেখেছি* গানটির যথার্থতা পেয়েছি তার মাঝে।

তার চারটি নাম।

এর ভেতর নার্গিস নামটা আমার পছন্দ। তাকে কোনোদিন বলা হয়নি। আর কোনোদিন বলতেও যাবো না। তবে শুধু তার স্মৃতি নিয়ে, আমার মনের মাধুরী দিয়ে তার যে ছবি তৈরি করেছি সে ছবি নিয়ে আমার দিন চলে যাবে। অন্য কাউকে কোনোদিন ভালোবাসতে পারবো না।

লাবণ্যকে অমিত তার মনের মাধুরী দিয়ে সাজিয়েছিল বলেই লাবণ্য তার কাছে এতো অসম্ভব প্রাপ্তি। বাস্তব জীবনে তাদের বিয়ে হলে অমিতের কাছে লাবণ্য উজ্জ্বলতা এবং লাবণ্যতা হারাতো।

তাকে বলবো না এ জন্য, শাদা চশমার ভেতর দিয়ে অসম্ভব সুন্দর দুটি চোখ দিয়ে সে আমাকে বুঝিয়েছে যে, আমাকেও তার ভালো লাগে। অসম্ভব সুন্দর চোখ দুটির ক্যারিসমার জন্যই হয়তো তার প্রতি আরো বেশি দুর্বলতা জন্মেছিল। এমএসসি-তে ফার্স্ট ক্লাস পাবার পর এবং বিসিএস পরীক্ষা ভালোভাবে সম্পন্ন হওয়ায় যখন বুঝতে পারি। আমার হয়তো হয়ে যাবে তখন সিদ্ধান্ত নেই যে, নির্ভয় হয়ে তাকে অন্তত আমার ভালো লাগার কথাটা সরাসরি জানাতে হবে এবার।

একদিন তাকে আমার এক বন্ধুর মাধ্যমে বলি যে, আমার কিছু কথা আছে।

সে কথা বলতে রাজি হয়নি। উপরন্তু এমন একটা আচরণ করে যেন আমাকে সে চেনেই না। যাকে আমার এতো ভালো লাগে, একটা স্মার্ট মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও তার কাছ থেকে এমন ব্যবহার আশা করিনি।

অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে পড়ি সেই সঙ্গে জন্ম নেয় ক্ষোভ। আমি ভিন্ন পথে পা বাড়াই। তার এই ব্যবহারের জন্য আজ আমার মূল্যবোধ নষ্ট হয়ে গেছে। হারিয়ে গেছি। আমার ভালোবাসা হারিয়ে গেছে। অথচ তার সঙ্গে কথা বলে আমার চাওয়ার তেমন কিছু ছিল না।

আজো চিন্তা করি, তাকে যদি শুধু এটুকু বলতে পারতাম যে, তোমার অস্থি, মাংস, শরীরের প্রতি আমার কোনো চাওয়া নেই, আমি শুধু তোমার প্রতি দারুণভাবে মুগ্ধ, তোমাকে ভালোবাসি। তুমি আমার হলেও আমি তোমাকে ভালোবাসবো, না হলেও ভালোবাসা কমবে না। কেননা আমার ভালোবাসা শরীরের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। তাহলে হয়তো আমার জীবনের একটা সার্থকতা পেতাম। এবং সেই সঙ্গে বল তার পায়ে ছেড়ে দিতে পারতাম।

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

পরাজিত

– স্রোত

অনার্স সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্রী আরেফিনা। চটপটে, দুরন্ত ও সুন্দরী মেয়ে সে। ছাত্রী হিসেবে শীর্ষস্থানীয়। তাকে সব সময় এড়িয়ে চলতাম তার মুডি স্বভাবের জন্য। কতো ছেলেকেই না সে তার প্রেমে হাবুডুবু খাইয়ে দেবদাস বানিয়েছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। ক্লাসের সবচেয়ে বেশি ভদ্র ও নরম ছেলে রাজুকে কতো না অপমান করে, নাজেহাল বানিয়ে ছেড়ে দিল। রাজু তার কাছে প্রেমের অফার দিলে সে সোজা জানিয়ে দিল, তোমার যা গায়ের রং, অন্ধকারে খুজেই পাওয়া যাবে না।

কতো বড় অপমান। তার উপর সবার উপস্থিতিতে। অন্য ছেলে হলে আত্মহত্যা করে বসতো।

ফার্স্ট ইয়ারের শেষের দিকে কানাডাবাসী এক মামা আমার জন্য একটি ব্যতিক্রমী মডেলের সানগ্লাস পাঠিয়েছিলেন। প্রথম যেদিন কলেজে পরে যাই আরেফিনা অবাক হয়ে আমার দিকে প্রায় ত্রিশ সেকেন্ড তাকিয়ে ছিল। ক্লাসের সবাই চশমার প্রশংসা করলো।

পরের দিন জমিবরস্যারের ক্লাস শেষে সে আমাকে ডাকলো। বিজ্ঞান ভবনের সামনে পুকুর ধারে সে আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে বলে প্রস্তাব রাখলো।

আমিও রাজি হলাম। মহাখুশি যেন যুদ্ধে জয়ী সেনাপতি। ক্লাসে আমরা দুজন বেশ ঘনিষ্ঠ হলাম। প্রায় অনুষ্ঠানে সে আমার চশমা নিয়ে যাওয়া শুরু করলো। আমি তার রূপে পাগল হয়ে চশমা ধার দিতে থাকলাম। শুধু তাই নয়, প্রায় সে আইসক্রিম, চায়নিজ খাবার, ফাস্ট ফুড খাবে বলে আবদার করতো। আমি দ্বিধা বোধ করতাম না। বাবার টাকা, চাওয়া মাত্র পাওয়া।

এভাবে সে আমাকে শোষণ করতে থাকলো। আমি দেউলিয়া হতে থাকলাম। এমন পরিস্থিতিতে আমাকে বন্ধুরা সবাই সাবধান করতো এই বলে যে, আরেফিনা টাউট মেয়ে, তোকে ফতুর করে সে চলে যাবে। তখন সর্ষের ফুল দেখবি চোখে। সময় থাকতে সাবধান হয়ে যা।

কিন্তু আমি কারো কথা তোয়াক্কা করতাম না। বরং নিজ থেকেই তাকে বেশি বেশি করে দিতাম।

ত্যাগের কাছে মানুষের অহংকারী মনও যে দমে যায় তার প্রমাণ পেলাম আরেফিনার ক্ষেত্রে। সে বর্তমানে আমার স্ত্রী। আমি সরকারি চাকরি করি, একই সঙ্গে দুজনে মাস্টার্স পাস করেছি।

প্রথম বিয়েবার্ষিকীতে সে আমাকে বললো, জানো আমি তোমার চশমা নেয়ার জন্যই শুধু তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলাম। আমার প্ল্যান ছিল তোমার কাছ থেকে চশমা নিয়ে কেটে পড়বো। কিন্তু তোমার ভালোবাসার কাছে আমি পরাজিত হলাম। তোমার উদারতা আমাকে বদলে দিল। আস্তে আস্তে আমি দুর্বল হয়ে পড়লাম।

এ কথা শুনে সে রাতেই আমি আমার বৌকে চশমাটি আমাদের বিয়েবার্ষিকী উপলক্ষে গিফট করি। সেই সঙ্গে আমার মামাকে ধন্যবাদ জানাই যে, মামা আমাকে চশমার সঙ্গে এমন একটি মেয়েও (পরোক্ষভাবে) উপহার দিলেন। এই সুন্দর চশমার বিনিময়ে সে এখন প্রায়ই আমার বুকে ঘন ঘন নিঃশ্বাস...না এটা শুধু আমাদের দুজনের ব্যাপার, এখানে অন্যের কান পেতে শোনা নিষেধ।

দিনাজপুর থেকে

দুর্ঘটনা

– মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান কামাল

ফাহিম আমার বন্ধুদের মধ্যে একজন। সে ছিল আমার বস্ত্রহীন জীবনের খেলার সঙ্গী। সেই থেকে আজ পর্যন্ত ফাহিমের সঙ্গে টু শব্দটি পর্যন্ত হয়নি। একই সঙ্গে বেড়ে ওঠা, একই ক্লাসে পড়াশোনা। আজ পর্যন্ত একজনের দুঃখ দেখলে অন্যজন কাদতে পারি। সুখ, আনন্দ ভাগাভাগি করে নিতে পারি। পাড়ায় আমাদেরকে সবাই *মানিকজোড়* বলে ডাকে। তার অবশ্য যথেষ্ট কারণও আছে। আমাদের ছিল দুইখানা সাইকেল। তাও আবার একই রকমের। তার কোথাও যেতে হলেই ডাক পড়তো আমার এবং আমার বেলায়ও তাই।

সবেমাত্র ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা শেষ হয়েছে। দুজনারই পরীক্ষা ভালো হয়েছে। দূরে কোথাও বেড়াতে যাবো ভাবছি। এরই মধ্যে ফাহিমদের বাসায় ঢাকা থেকে তার তিন চারজন মামতো ভাইবোন বেড়াতে এসেছে। তারাও কে এসএসসি দিয়েছে, কেউ দিয়েছে ইন্টারমিডিয়েট। এদের মধ্যে একটি মেয়ে ছিল খুব সুন্দরী। নাম রিনি। চোখে ছিল হালকা গোলাপি গ্লাসের চশমা।

প্রথম দর্শনেই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। আল্লাহর সৃষ্টি এতো সুন্দর হতে পারে জানা ছিল না! আল্লাহকে ধন্যবাদ দিলাম এতো সুন্দর করে তাকে গড়ার জন্য। দেখা হলেই চোখাচোখি, মুচকি হাসি। কেমন যেন তাকে ভালো লেগে গেল। এর নাম ভালোবাসা, নাকি অন্য কিছু তা তখনো বুঝতে পারিনি। ফাহিমকে বললাম ব্যাপারটা।

সে আমাকে আশ্বাস দিল, তোর জন্য যা যা করার দরকার সবই করবো।

ফাহিমের মাধ্যমেই প্রস্তাবটা দিলাম। সন্তোষজনক সাড়া পাওয়া গেল ওপার থেকে।

একদিন সবাইকে নিয়ে আমদের বাসায় আসতে বললাম।

সন্ধ্যার পরই দেখলাম ফাহিমের আম্মাও বোনেরাসহ বিশাল এক বহর। এক পর্যায়ে রিনিসহ ওরা দুই তিনজন আমার রুমে এলো। ফাহিম কৌশলে রিনি ছাড়া বাকিদের নিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে গেল। কারো মুখে কোনো কথা নেই। পাশে গিয়ে বসলাম। দেখি একটুও নড়ছে না। এক সময় পরম নির্ভরতায় তার হাত ধরলাম। বেপরোয়া ঠোট দুটিকে আর ধরে রাখতে পারলাম না। চুমোয় চুমোয় তার সমস্ত মুখমণ্ডল ভরিয়ে দিলাম। চোখ থেকে চশমাটা খুলে ফেলাম। এরপর আমার চুমোর বদলে অনেকগুলো চুমো সে দিল। তারপর সে থামলো।

ঘণ্টা খানেকের মতো ছিল আমাদের বাসায়। রিনি আমাদের বাসায় থাকতেই দেখছিলাম তার চশমাটা আমার বিছনায় পড়ে আছে। ইচ্ছে করেই তাকে দিলাম না। ভাবছিলাম এই চশমা নিতে আগামীকাল

আবার আসবে। তখন হয়তো বা আবার খুব কাছ থেকে দেখতে পাবো তাকে। কিন্তু পরদিন সকালে এই কাছ থেকে দেখার সাধ মিটিয়ে দিল ফাহিমের একটি দুঃসংবাদে।

খুব সকালে ফাহিমের ডাকে ঘুম ভাঙলো। ফাহিম যা বললো তা ছিল সত্যিই দুঃখজনক। গত রাতে রিনি ভুল করে তোদের বাসায় চশমা রেখে যায়। রাত এগারোটার দিকে রিনি বাথরুমে যায়। ছিটকানি লাগানোর পর ধপাস শব্দে মা দৌড়ে আসে ভেতর থেকে গোংগানির শব্দ শোনা যায়। মা রিনি রিনি বলে চিৎকার করতে থাকেন। মায়ের চিৎকার শুনে আমরা সবাই দৌড়ে আসি। দরজা ধাক্কাতে থাকি। পরে শাপল দিয়ে দরজার ছিটকিনি ভেঙে ফেলি। ভেতরে ঢুকে দেখি রিনি অজ্ঞান হয়ে রক্তাক্ত মেঝেতে পড়ে আছে। ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে আসি। মেডিকালে নিয়ে যাই। তিন ঘণ্টা পর জ্ঞান ফেরে, মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পায়। পেছন দিকে মাথার কিছু অংশ কেটে যায়। রাতেই দুই ব্যাগ রক্ত দিই। এখন মোটামুটি সুস্থ। অনেক রাত বিধায় তোকে জানায়নি।

বাকরুদ্ধ হয়ে গেলাম। সমস্ত শরীর যেন ঘাম দিয়ে ছাড়লো। ভাবছি আমার এই ইচ্ছাকৃত ভুল রিনির জন্য কতো বড় বিপদ ডেকে আনলো। তার সামনে গিয়ে কোন মুখে দাড়াবো। যদিও রিনি জানে না যে, তাকে ইচ্ছা করেই চশমাটা দিইনি।

কি রে রিনিকে দেখতে যাবি না?

ফাহিমের কথায় ভাবনার ছেদ পড়লো। হ্যা, অবশ্যই যাবো।

দুই মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে ফাহিমকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম মেডিকালের উদ্দেশ্যে, সঙ্গে রিনির চশমাটিও নিলাম।

বরিশাল থেকে

জেলখানায়

– কয়েছ আহমেদ

২০০১ সালে ষড়যন্ত্র করে আমার নামে মিথ্যা মামলা করা হয়েছিল। সে জন্য পুলিশ প্রথমে আমাকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়েছিল। তারপর কোর্ট ও সেখান থেকে জেলখানায় যেতে হয়েছিল।

জেলখানার বড় গেটে নিয়ে অন্যান্য কোর্ট ফেরত আসামিদের সঙ্গে আমাকেও তল্লাশি করা হলো সঙ্গে অবৈধ কিছু আছে কি না।

তারপর এক রুমে নিয়ে আমার কাগজের নাম ও ঠিকানা মেলানো হলো।

একজন জিজ্ঞাসা করলেন প্যান্টের সঙ্গে বেল্ট আছে কি না। তারপর ম্যাচ, ঘড়ি আছে কি না।

সব কয়টি উত্তরেই না বললাম।

পরে অবশ্য জেনেছি, বেল্ট, ম্যাচ, ঘড়ি জেলখানায় অবৈধ। তারপরও জেলখানার ভেতর ম্যাচ পাওয়া যায় যা দিয়ে আসামিরা সিগারেটে আগুন ধরায়।

কিছু সময় পর সেই কেরানি বললেন, আপনি সানগ্লাস নিয়ে ভেতরে যেতে পারবেন না। এটি রেখে যান। পরে পাস করিয়ে নিয়ে যাবেন।

পরে জেনেছি পাস করানো মানে জেলারের অনুমতি নেয়া।

কেরানিকে বললাম, আমার চোখে সানগ্লাস নয়, এটি পাওয়ারের চশমা।

তার সেই একই গো। চশমা বা সানগ্লাস যাই হোক না কেন, তা নিয়ে ভেতরে যেতে পারবো না।

তাকে বোঝাতে পারলাম না যে, এই চশমাটি আমার শরীরের একটি অঙ্গের মতো হয়ে গিয়েছে। আমার চশমার কাচের পাওয়ার মাইনাস ফোর পয়েন্ট জিরো জিরো। এ চশমা ছাড়া আমার চলাফেরার উপায় নেই।

কিছু সময় পর একজন আসামি আমাকে এক পাশে ডেকে নিয়ে কানে কানে বললেন, আমি যেন কিছু টাকা দিয়ে দিই। তাহলে এসব ঝামেলা হবে না।

জেলখানায় টাকা অবৈধ জানতাম। তাই সঙ্গে টাকা-পয়সা নেইনি। বাধ্য হয়ে জেলখানার গেটের পাশে দাড়িয়ে থাকা আম্মার কাছ থেকে পুলিশকে দিয়ে টাকা আনালাম। তারপর সে টাকা দেয়ার পর চশমা পাস না করিয়ে চোখে দিয়ে ভেতরে ঢুকতে পেরেছিলাম।

প্রথমদিনই জেলখানার ভেতর ঢুকে বুঝতে পেরেছিলাম, জেলখানায় টাকা হলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। যারা গরিব, জেলখানায় তাদের খুব কষ্ট হয়।

জেলখানার ভেতরে গিয়ে আরো বেশি সমস্যায় পড়েছিলাম ওয়ার্ডে ধারণ ক্ষমতার চেয়ে বেশি আসামি ছিল। ঘুমাতে যাবার সময় চশমা কোথায় রাখবো? মাথার পাশে যে রাখবো সে উপায়ও নেই। কারণ আমার পাশের আসামি যদি লম্বা করে আমার চশমার ওপর হাত ফেলে দেয় তাহলে চশমা ভেঙে যেতে পারে। চশমা ভেঙে গেলে দেখবো কিভাবে? সে জন্য হাতের মুঠোয় চশমা রেখে ঘুমিয়েছিলাম। ঘুম ভালো হয়নি। একে নতুন জায়গা, তার উপর একশ পাওয়ারের বালব জ্বালানো থাকা, এর উপর যুক্ত হয়েছিল চশমার চিন্তা।

কিছু দিন জেলখানায় থাকার পর আমার পরিচিত মসাহিদ ও শাহীনভাইকে পেয়েছিলাম। তারা পুরনো আসামি। ওয়ার্ড বদল হওয়ায় তাদের কাছে যেতে পেরেছিলাম। তাদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর জেলখানার অনেক নিয়ম-কানুন জেনেছি।

পনেরো দিন জেলখানায় থাকার পর আমার নাম হয়ে গিয়েছিল চশমাভাই। কেউ ডাকতে চাইলে ডাকতো, ও চশমাভাই বলে।

এর মধ্যে বাড়ি থেকে কাপড় রাখার জন্য ব্যাগ আনিয়েছিলাম। সে ব্যাগের মধ্যে রাত্রে চশমা রাখতাম। সে ব্যাগ দেয়ালে পেরেক মেরে রাখা হতো।

ঘুমাতে যাবার আগে ব্যাগে চশমা রেখেও নিশিন্তে ঘুমানো যায় না। এসব পুরনো বিল্ডিংয়ের মেয়াদ অনেক আগেই পেরিয়ে গেছে। কোনদিন ভেঙে পড়বে বলা যায় না। এসব দিকে কর্তৃপক্ষের কোনো খেয়াল নেই। এসব দেয়াল থেকে পলেস্তরা খসে পড়লে পেরেক খুলে পড়বে, তারপর ব্যস, পাকা মেঝেতে পড়বে এবং চশমাও ভেঙে যেতে পারে।

এভাবে প্রতিদিন টেনশন নিয়ে ঘুমাতে যাই।

জেলা কারাগার, মৌলভীবাজার থেকে

ডোন্ট টাচ মি!

– শাহদাৎ হোসেন রাসএল

ঘটনাটা পরেও বুঝতে পারিনি, শুধু এই সামান্য ঘটনা আমাকে অহর্নিশ কাদাবে। এই সোনালি ফ্রেমের সানগ্লাসটা আমার কাছে সবচেয়ে জ্বালাময় স্মৃতি বহন করবে!

তখন কাপাসিয়ার কলেজ রোডে থাকি। সঙ্গে এক দূরসম্পর্কের মামা। সেই মামার সম্পর্কের রেশ ধরে ধীরে ধীরে প্রবেশ করি আমার *দেবী* গৃহে। এক সময় পাশাপাশি বাড়ি থাকায় ওদের বাড়িতে আমার যাতায়াত

অবাধ। আমার দেবী আমার লুনা। এ সেই লুনা যার চরণে একটা চুমু একে দেয়ার জন্য নির্ঘুম রাত প্রতীক্ষায় থাকি। আজও নীরব রাতে চোখের জলে বালিশ ভিজে যায় শুধু তার কথা মনে করে।

সেই অভিশপ্ত রাতে আমি এবং লুনা তাদের বাসায় বসে টেলিভিশন দেখছি। তাদের বাসায় মানব আর মানবী বলতে আমরা দুজন। লুনা আমাকে মামা ডাকতো। হয়তো তার কাছে আমি শুধু মামা ছিলাম। কিন্তু সে যেন আমার কাছে আরো কিছু ঠিক অক্সিজেনের মতো যা ছাড়া প্রাণের অস্তিত্ব কল্পনাতীত। তার মুখের এক ঝলক হাসির বিনিময়ে আমি স্বর্গ ছেড়ে নরকে যেতে পারি। এটা কি মামার ভালোবাসা, নাকি তা প্রেমিকের জানি না।

আমি আর লুনা টিভি দেখতে দেখতে কথা বলছিলাম। তার চোখে হালকা সোনালি রঙের সানগ্লাস। অপূর্ব লাগছিল। এই চোখকে কারো সঙ্গে তুলনা করা যায় না। হোক সে ইজিপ্টের রানী ক্লিওপাট্রা অথবা ট্রয় শহরের হেলেন।

এমন সময় এলো সেখানে মনিরমামা। কিছুক্ষণ পর মনিরমামা চলে যাবার সময় আমাকে বললো, রাসএল, তুমি কি বাসায় ফিরবে?

হ্যা, এখনি ফিরবো।

চলো তবে এক সঙ্গে যাই।

চলুন।বলে খাট থেকে নামতে চাইলাম। এমন সময় হঠাৎ আমার শার্ট ধরলো লুনা।

প্লিজ মামা, আজ যাবেন না, এক সঙ্গে সিনেমা দেখবো, এখনি টিভিতে সিনেমা শুরু হবে।

মনে মনে ভাবলাম, লুনা এক রাত তো সামান্য। তুমি চাইলে সারা জনম তোমার পায়ের কাছে বসে প্রার্থনা করে কাটিয়ে দিতে পারি। মুখে বললাম অন্য কথা। কারণ মনিরমামাকে ফিরিয়ে দেয়াটাও ভালো দেখায় না। কেননা মনিরমামা ভালোবাসেন লুনাকে আর লুনার পরিবারে আমায় ঘনিষ্ঠ করে দিয়েছে মনিরমামা যার একমাত্র উদ্দেশ্য, আমার দ্বারা লুনাকে মনিরমামার সঙ্গে সম্পর্ক করায় রাজি করানো। তাই বললাম, নাহ লুনা, অনেক রাত হয়ে গেছে, চলি। আবার অন্য দিন এক সঙ্গে সিনেমা দেখবো।

কিন্তু লুনা তার কথায় অনড়, তার সঙ্গে সিনেমা দেখতেই হবে। মনিরমামারও এক কথা, আমাকে সঙ্গে নিয়েই যাবেন। আমি তাদের দুজনার তুরুপের তাশ যেন। খেলছে দুজনেই। মনিরমামা হাত ধরে টান দিলেন। কিন্তু তখনো লুনার নিষ্পাপ হাত ধরে আছে আমার শার্ট।

বললাম, লুনা শার্ট ছিড়বে, ছেড়ে দাও।

না, ছাড়বো না। শার্ট ছিড়ে যায় যাক।

আমি তাদের হাতের পুতুল হয়ে নিশ্চুপ থাকলাম।

মনিরমামা হাত ধরে জোরে টান দিলেন। কিন্তু লুনার হাতের মুষ্ঠিও অনড়। মনিরমামার আচমকা টানে লুনার ধরে থাকা আমার শার্ট-এর তিনটে বোতাম ছিড়ে মেঝেতে পড়লো। নিজেকে ছাড়াতে চেষ্টা করতেই হাতের ধাক্কায় লুনার চোখ থেকে সানগ্লাস নিচে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঝনঝন শব্দে সানগ্লাসের কাচ ভেঙে ছড়িয়ে পরলো ফ্লোরে। আমার মাথার ভেতরও যেন ঝনঝন শব্দ হলো। ঘটনার আকস্মিকতায় বোবা হয়ে গেলাম দুই মানব আর এক মানবী।

নিজেকে সামলে ফ্লোর থেকে সানগ্লাসের শূন্য ফ্রেম হাতে তুলে নিলাম। লুনার দিকে হাত বাড়িয়ে বললাম, লুনা তোমার চোখে লাগেনি তো?

হঠাৎ কি হলো জানি না। লুনা পেছনে সরে গিয়ে উচ্চস্বরে বললো, ডোন্ট টাচ মি!

আমি হাত গুটিয়ে নিলাম। ভাবছি! এসব হলো কি, কি করলাম আমি! লুনা আমায় ক্ষমা করো। কৃপা করো আমায়। মনিরমামা নির্বাক দর্শক। সানগ্লাসের ফ্রেম হাতে পা বাড়ালাম রাতের সুগভীর অনির্দিষ্ট আধারে, সঙ্গে মনিরমামা। লুনার আগুন জ্বলা চোখে আর তাকাতে পারলাম না।

এর পরদিন অনেক চেষ্টা করে পাওয়ার মিলিয়ে ফ্রেমে গ্লাস ফিট করে লুনাকে দিয়েছিলাম। সব কিছু চললো আগের মতো। কিন্তু তারপর থেকে কোথায় যেন সংকোচ রয়ে গেল। এরপর কোনোদিন লুনাকে স্পর্শ করিনি।তার মুখের ওই একটা কথা, ডোন্ট টাচ মি! প্রতিনিয়ত কানে বাজতো।

লুনা একদিন মনিরমামার দেয়া লাল বেনারসি পরলো। আর আমি ডুবে গেলাম শরাবের হলুদ জলে।

মনে পড়ে কতোদিন লুনা, আমি এক সঙ্গে বৃষ্টি স্নান করেছি। পুকুরে সাতার কেটেছি। পাঞ্জা লড়েছি। তারপর একটা সানগ্লাস ঝনঝন করে উঠলো। ভেঙে গেল সব স্বপ্ন, সাধ, ভালোবাসা।

কোনো কিছু ভাঙার ঝনঝন শব্দ শুনলে চমকে উঠি, ভাঙলো না তো কারো সানগ্লাস? ভাঙলো না তো কারো মন?

নড়িয়া, শরিয়তপুর থেকে

বুড়ি

– তানিয়া সুলতানা রিমা

তখন ক্লাস সিক্সে পড়ি। একদিন দুপুরবেলা স্কুল থেকে ফিরছিলাম। বাসার কাছাকাছি আসতেই পেছন থেকে কে যেন আমার একটা হাত খপ করে ধরে ঝাকুনি দিল।

চমকে উঠে পেছনে ঘুরে তাকাতেই দেখি, অদ্ভুত এক বুড়ি। জোড়াতালি দেয়া ময়লা একটা শাড়ি পরা, হাতে হরেক রকম চুড়ি, বাম হাতে একটা কাপড়ের ব্যাগ আর ডান হাতে একটা লাঠি ভর দিয়ে হাটার জন্য।

এই পিকিউলিয়ার বৃদ্ধা এবার আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, মনু, চশমা দ্যায় কোতায় কইতে পারো?

এতোক্ষণে খেয়াল করলাম তার চশমাটার দিকে। তার চশমার ফ্রেমের দুই পাশের ডাটই ছিল ভাঙা। সেই ভাঙা ফ্রেম আবার পাটের দড়ি দিয়ে প্যাচিয়ে জোড়া দেয়া। আর ফ্রেমের ডাটের দুই মাথা দড়ি দিয়ে আটকিয়ে অনেকটা মাথার মুকুট যেভাবে পরে সেভাবে মাথায় আটকানো সেই চশমার এক চোখের গ্লাস চোখের সোজাই ছিল। কিন্তু অন্যপাশ বাকা করে মাথার ওপরে ওঠানো।

অদ্ভুত এই বুড়ি তার কথার উত্তর না পেয়ে আবারও আমার হাত ঝাকুনি দিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, *মনু, চশমা দ্যায় কোতায় কইতে পারো?*

বুড়ির প্রশ্ন শুনে এবং তার অবস্থা দেখে খুব মায়া লাগলো। আহা, বেচারী! চশমা কিভাবে পরতে হয় তাও জানে না! পরম মমতা ভরে তার চশমাটা ধরে ঠিকভাবে পরিয়ে দিতে গেলাম।

কিন্তু একি! আমাকে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত করে দিয়ে চেচিয়ে উঠলো বুড়ি, *মাথায় হাত দ্যাও ক্যা? মাথায় হাত দ্যাও ক্যা?*

লাফ দিয়ে তার কাছ থেকে দুই হাত দূরে ছিটকে গেলাম।

মহিলা এবার তার হাতের লম্বা লাঠিটা উচিয়ে আমাকে মারার জন্য তাড়া করে এলো। আর বলতে লাগলো, *আমি জিগাই চশমা দ্যায় কোতায়? আর মাইয়াডার কতো বড় সাহস, আমার মাথায় হাত দ্যায়!* আমার এতো সুন্দর চশমাডা নিয়া যাইতে চাইছিল...।

তখন দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে ছুটতে লাগলাম বাসার উদ্দেশ্যে।

পরের দিন ডাক্তার আংকলের কাছে শুনলাম, আমাদের বাসার পাশের সরকারি হাসপাতালে *সন্ধানী*–র উদ্যোগে ফৃ চোখের ছানির অপারেশন করানো হচ্ছে। তখন বুঝলাম, পাগলা বুড়ি নিশ্চয়ই ভেবেছিল সেখানে গেলেই তার চোখের উপযোগী একটা ভালো চশমা দেয়া হবে। এ কথা বোঝার পরে সেই *চমশা বুড়ির* জন্য ভীষণ মায়া লাগলো।

আজো পথেঘাটে যখন গরিব কোনো বৃদ্ধ বা বৃদ্ধাকে দেখি যারা টাকার অভাবে চোখের চিকিৎসা করাতে পারে না, আমার দেখা সেই চশমা বুড়ির মতো একটা লাঠিকে সম্বল করে চশমা বিহীনভাবে অন্ধ মানুষের মতো হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে হাটে তখন খুব মায়া লাগে। আর মনে মনে ভাবি, এসব অসহায় গরিব বৃদ্ধ–বৃদ্ধাদের চোখের যথাযথ চিকিৎসা করিয়ে তাদেরকে বিনা পয়সায় চশমা দেয়া কি কোনো বিত্তবান মানুষের পকেট থেকে কিংবা সরকারি অর্থ তহবিল থেকে খুব বেশি পয়সা গচ্চা যাবে!

চরফ্যাশন, ভোলা থেকে

অবচেতন মনে

– ডালিয়া নিলুফার খান

ছোটবেলা থেকে মাকে সব সময় চশমা পরা অবস্থায় কি সুন্দর লাগতো! তবে চশমা খুললে যখন দেখতাম মায়ের টানা চোখ দুটো চশমা পরার কারণে কেমন বসে গেছে তখন মনটা খুব খারাপ হয়ে যেতো! দুর্ভাগ্য আমার, স্কুলে থাকতেই নিতে হলো চশমা। তবে পাওয়ার কম থাকাতে ইচ্ছা–অনিচ্ছায় ভুলে যেতাম পরতে। এবং চশমাটা হারিয়ে বেমালুম চেপে যেতাম মায়ের কাছে। তবে যখন আবার ধরা পড়ে দ্বিতীয়বারের মতো চশমা নিতে হলো তখন দেখি চশমার পাওয়ার বেশ বেড়ে গেছে। তারপর রীতিমতো চশমা পরে থাকতে হতো। মনে হতো বিনা দোষে কারাবাস।

ইতিমধ্যে স্কুল–কলেজ, টিভি–সিনেমা দেখায় নিয়মিত চশমা পরলেও কোথায় বেড়াতে গেলে, রিহার্সালে, নাচের ফাংশনে, ওস্তাদ–এর সামনে বসে গান শেখার সময়, বাড়িতে বা বাইরে কোনো অনুষ্ঠান হলে নো চশমা! কেউ দরজায় কড়া নাড়লেও অজান্তে কি মানস–রাজপুত্র আশা করতাম? অনেকদিন পরে আমার এই অভ্যাসের জন্য লজ্জা পেতে হয়েছে আমার ছোট বোনটির কাছে।

আমার হবু স্বামী আমাকে হঠাৎ দেখতে এসেছে আমাদের বাসায়।

ও ঢুকতেই বোন জেসমিনের সাবধান বাণী শুনতে পেলাম। ডালিয়াআপা, শিরুভাই এসেছে, চশমা খোল।

হবু স্বামীর সামনে চশমা! সিক্রেট আউট হয়ে গেল।

ছোটবেলা থেকে রোদে তাকাতে পারতাম না বলে সানগ্লাস পরতাম এবং কালক্রমে পাওয়া দেয়া সানগ্লাস পরা শুরু করলেও পুরান ঢাকার রসালো টিপ্পনি শুনতে হতো, ইশ! ছেড়ি কালা চশমায় স্টাইল মারে!

স্বামীর কূটনীতিক চাকরির কারণে ডিনার রিসেপশন ইত্যাদি লেগেই থাকতো। ওসব অনুষ্ঠানে চশমা না পরে গেলে চেনা লোককে চিনি না, অচেনাকে চেনা বলে ভুল করে কথা বলি!

স্বামীর চাকরির সমূহ বিপদ ভেবে কন্টাক্ট লেন্স ধরলাম। এমনি ভাগ্য! বার্মিজ নববর্ষ বরণে ঢোকার সঙ্গেই পানির হোস পাইপ দিয়ে অবগাহনের তোড়ে চোখের একটা লেন্স ছিটকে কাদায় মিশে গেল! আমার ভেজা নতুন শাড়ির দুঃখের থেকে কানা হয়ে যাওয়ার দুঃখ এখনো প্রাণে বাজে!

এরপর মোট পাচবার লেন্স হারিয়ে আপাতত অবশিষ্ট একটা লেন্সই সযত্নে রেখে দিয়েছি স্মৃতি হিসেবে। কারণ ১৯৯৭–র ডিসেম্বরে বৃটিশ অধিকৃত হংকং যখন চায়নার কাছে হস্তান্তরিত করা হলো তখন সেই অনুষ্ঠানে পৃথিবীর প্রায় সব দেশের সরকারপ্রধান, বিশেষ ব্যক্তিরা এসেছিলেন। আমি সেই সুযোগ

কোনোমতেই হেলায়-ফেলায় নষ্ট করবো না। তাই এক চোখে লেন্স লাগিয়ে রিসেপশনে আতি-পাতি করে খুজতে লাগলাম পৃন্স চার্লসকে! মার্গারেট থ্যাচার, রবিন কুক প্রমুখদের দেখে মন ভরলো না।

পাশের ভদ্রলোক বারান্দায় সিগারেটের ধুয়া আমার মুখে ছড়িয়ে হ্যালো বলে আলাপ শুরু করলেন।

ভাগ্য ভালো, পৃন্স চার্লস সবার সঙ্গে পরিচিত হলেন। আমার সঙ্গেও হাত মেলালেন। বাংলাদেশে তখনকার ঘটে যাওয়া টর্নেডোর কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

কিন্তু হায়! আমি উত্তর দিচ্ছি আর চোখ বেয়ে অঝোরে পানি ঝরছে। সিগারেটের ধোয়ার কারণে এই বিপত্তি! পৃন্স ভাবলেন ওকে দেখে আপ্লুত হয়ে কাদছি, নাকি দেশের দুঃখে আমার এই অশ্রুবরণ।

এখনো কাজে, ঘরে, সংসারে চশমা পরলেও হঠাৎ কেউ এলে অজান্তে চশটা খুলে কোথায় যে লুকাই, পরে সেটা খুজতেও গলদঘর্ম হতে হয়। এর পেছনে মনস্তাত্বিক কি কারণ? আমি তো মায়ের মতো মায়াবী চোখের অধিকারী নই। চশমা পরলে কি সৌন্দর্য হানি বা বয়স বৃদ্ধির ভীতি অবচেতন মনে কাজ করে? মেয়েরা কি সবকালে, সব বয়সেই এমন দ্বিধাগ্রস্ত, অনিরাপদ নাকি আত্মসচেতন?

অস্ট্রেলিয়া থেকে

shiru47@hotmail.com